এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

গবেষণা শিরোনাম ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি : একটি মূল্যায়ণ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড: সাব্বীর আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

469998

Dhaka University Library
469998

গবেষকের নাম ঃ মোঃ এনামুল আলম তালুকদার
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং-১৮০/২০০৪-২০০৫
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: একটি মূল্যায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ কোন গবেষণা করেন নি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপিত করিনি।

মোহাম্মদ এনামুল আলম তালুকদার

মোঃ এনামুল আলম তালুকদার

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৮০/২০০৪-২০০৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

469998

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

RB
B
341.52
TAP

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: একটি মূল্যায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ কোন গবেষণা করেন নি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপিত করিনি।

মোহাম্মদ এনামুল আলম তালুকদার

মোঃ এনামুল আলম তালুকদার

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৮০/২০০৪-২০০৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

469998

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিঃ একটি মূল্যায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ এনামুল আলম তালুকদার-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং গবেষণা কর্মটি এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিবেচনা যোগ্য। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

ড. সাব্বীর আহমেদ

সহযোগী অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

469998

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারমর্ম

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের ফলে পাহাড়ীদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রামের সমাপ্তি হয়। পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতিরা সরকারের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। দেশান্তরিত পার্বত্য উপজাতি শরণার্থীরা পুনরায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে আসতে শুরু করে। চুক্তি সম্পাদনের পর এর প্রতিক্রিয়ায় পার্বত্য উপজাতিরা স্থানীয় ক্ষমতায়নের অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনায়, দেশ ও বিদেশে চুক্তিটি প্রশংসিত হয়। বিবিধ গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দল গুলোর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭' পরবর্তীতে 'শান্তিচুক্তি' নামে অধিকতর পরিচিতি পায়।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে? এই প্রশ্নটি গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রধানত গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা কর্মটির জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরী করার পাশাপাশি সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে গুণগত ও সংখ্যাগত উভয়দিক বিবেচনা করা হয়েছে।

শান্তিচুক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা চুক্তি। শান্তি চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের শর্ত মূলত পাহাড়ীদের স্বায়ত্বশাসনের বিকল্প হিসাবে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতা লাভের প্রতিশ্রুতি। অথচ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সব সরকারের আমলেই আঞ্চলিক পরিষদকে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। সরকার আজ অবধি আঞ্চলিক পরিষদের জন্য আলাদা কোন নিয়ম নীতি ও অবকাঠামো প্রণয়ন করেনি। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, লোকবল, অর্থ ও অবকাঠামোগত দূর্বলতায় স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক পরিষদ অনেকটাই অকার্যকর। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাবে পাহাড়ীরা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে কোন উপকারও পাচ্ছে না। পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে বাজেট তৈরী করে তখন তা পার্বত্য উপজাতিদের প্রয়োজনকে অবহেলিত করে। তাছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পার্বত্যবাসীদের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি না থাকায় আঞ্চলিক পরিষদ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করতে পারছে না। কেননা জেলা পরিষদে সরকার মনোনীত ব্যক্তি আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কাজ করার চেয়ে সরকারী দলের প্রতি বেশী আজ্ঞাবহ থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার সুকৌশলে স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যাবলী সম্পাদন করছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রণালয়কে অধিকতর

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দিয়ে মূলতঃ আঞ্চলিক পরিষদকে দুর্বল ও অকার্যকর করে রেখেছে। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না হলে পাহাড়ীদের স্থানীয় ক্ষমতায়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের অভাব অপরদিকে ক্রমাগতভাবে চুক্তির লংঘন পার্বত্যবাসীদের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরী করছে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা না করা; পাহাড়ীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য আলাদা কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অনুপ্রবেশ বন্ধে যথাযথ উদ্যোগের অভাব; স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর ব্যবহার; স্থানীয় উপজাতি নেতাদের হয়রানি; ভূমি অধিগ্রহণ; সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে জমির ইজারা; অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পূনর্বাসন না হওয়া প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার অন্যতম কারণ।

পার্বত্য উপজাতিরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি করে তখন বাংলাদেশের মতো এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় তা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। শান্তিচুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের শর্ত মূলত পাহাড়ীদের স্বায়ত্বশাসনের বিকল্প হিসাবে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতা লাভের প্রতিশ্রুতি। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিতে পাহাড়ীদের সশস্ত্র অন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না হলে পাহাড়ীদের স্থানীয় ক্ষমতায়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন ও পার্বত্য চটগ্রামে শান্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রায়োগিক ব্যবহারে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক অবস্থার উত্তোরণ ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি নিয়ে আসাই শান্তি চুক্তির একটি প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়াতে পাহাড়ীরা চুক্তির সুফল সমূহ উপভোগ করতে পারে নাই। ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানচিত্র (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক)

Dhaka University Institutional Repository

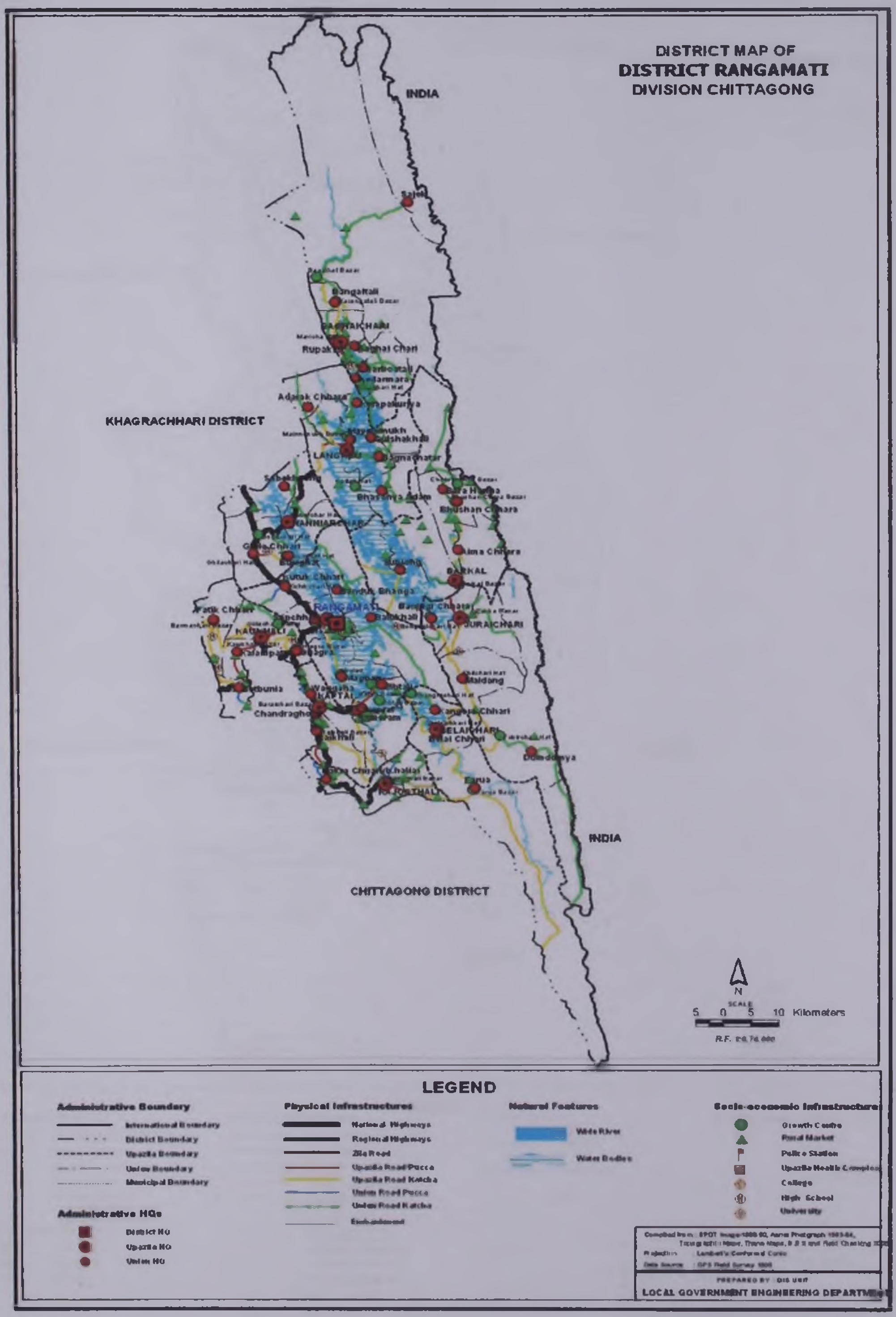

Dhaka University Institutional Repository

DISTRICT MAP
BANDARBAN DISTRICT
CHITTAGANG DIVISION

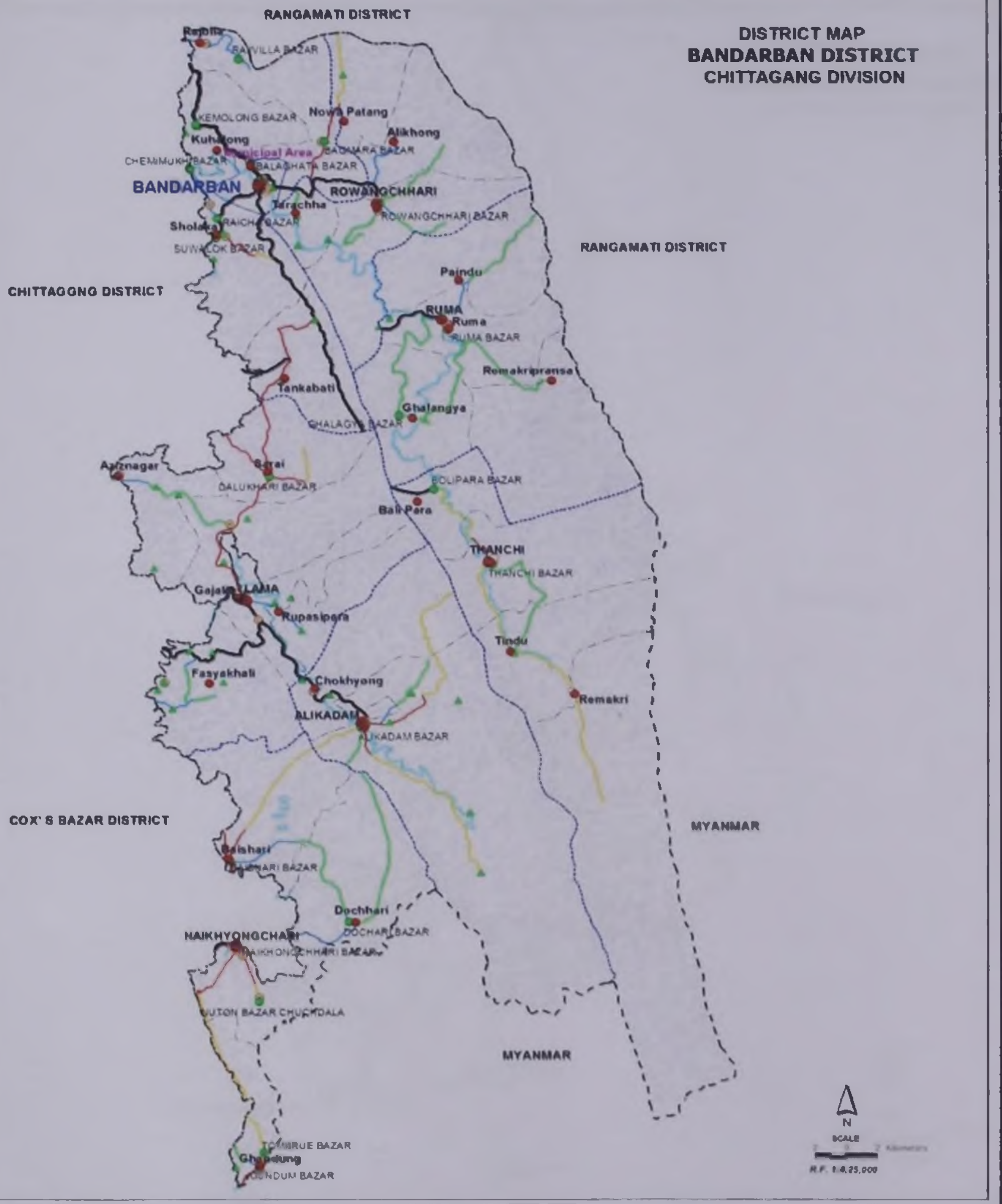

LEGEND

Administrative Boundary
- International Boundary
- District Boundary
- Upazila Boundary
- Union Boundary
- Municipal Boundary

Administrative HQs
- District HQ
- Upazila HQ
- Union HQ

Physical Infrastructures
- National Highways
- Regional Highways
- Zila Road
- Upazila Road Pucca
- Upazila Road Katcha
- Union Road Pucca
- Union Road Katcha
- Village Road A Pucca
- Village Road A Katcha
- Village Road B Pucca
- Village Road BKatcha
- Railway Network
- Embankment

Natural Features
- Wide River
- Water Bodies
- Khal

Socio-economic Infrastructures
- Growth Centre
- Rural Market
- Police Station
- Upazila Health Complex
- College
- High School
- University

Compiled from : SPOT Image 1988-89, Aerial Photograph 1983-84, Topographic Maps, Thana Maps, B.B.S and Field Checking
Projection : Lambert's Conformal Conic
Data Source : GPS Field Survey 1999

PREPARED BY : GIS UNIT
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

Dhaka University Institutional Repository

DISTRICT MAP OF KHAGRACHHARI DISTRICT

CHITTAGONG DIVISION

LEGEND

Administrative Boundary

- International Boundary
- District Boundary
- Upazila Boundary
- Union Boundary
- Municipal Boundary

Administrative HQs

- District HQ
- Upazila HQ
- Union HQ

Physical Infrastructures

- National Highways
- Regional Highways
- Zila Road
- Upazila Road Pucca
- Upazila Road Katcha
- Union Road Pucca
- Union Road Katcha
- Railway Network
- Embankment

Natural Features

- Wide River
- Water Bodies
- Forest Area
- Khal

Socio-economic Infrastructures

- Growth Centre
- Rural Market
- Police Station
- Upazila Health Complex
- College
- High School
- University

Compiled from : SPOT Image 1999-00, Aerial Photograph 1993-94, Topographic Maps, Thana Maps, B.B.S and Field Checking 200
Projection : Lambert's Conformal Conic
Data Source : GPS Field Survey 1999

PREPARED BY : GIS UNIT
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

Dhaka University Institutional Repository

List of Abbreviation

জে এস এস	: জনসংহতি সমিতি
বা স স	: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
UPDF	: United People's Democratic Front
UNDP	: United Nations Development Program.
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
ULFA	: United Liberation Front of Assam
NLFT	: United Liberation Front of Tripura
NSCN	: Nationalist Socialist Council of Nagaland
RSO	: Rohingya Solidarity Organization
ARNO	: Arakan Rohingya National Organization
BDR	: Bangladesh Rifles (currently it is BGB)
BGB	: Border Guard Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১ম অধ্যায় সূচনা

গবেষণা সমস্যা

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গবেষণার যৌক্তিকতা

গবেষণা অনুমিত ধারণা

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

গবেষণা সীমাবদ্ধতা

অধ্যায় পরিকল্পনা

সহায়ক তথ্যসূত্র

২য় অধ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

স্বাধীনতা পূর্ব প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতাত্তোর প্রেক্ষাপট

শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫)

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী গঠন

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৭-১৯৮০)

এরশাদের শাসনকাল (১৯৮৩-১৯৯০)

খালেদা জিয়ার শাসনকাল (১৯৯১-১৯৯৫)

শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬-২০০০) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন

পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ

সহায়ক তথ্যসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

শান্তির সংজ্ঞা

শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ উপায় সমূহ ঃ

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ :

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি কার্যকর মডেল

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সহায়ক তথ্যসূত্র

৪ অধ্যায় ভূমি অধিকার ও শান্তিচুক্তি

ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

ভূমি কমিশন

ভূমি জরিপ ও সাম্প্রতিক সমস্যা

পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১

পার্বত্য অঞ্চলে জমির ইজারা, অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির ইজারা বাতিলকরণ উদ্যোগ ও বাস্তবতা

সহায়ক তথ্যসূত্র

৫ অধ্যায় জাতীয় নিরাপত্তা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্রগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আঞ্চলিক -আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রভাব সমূহ

ভারতের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব

মায়ানমারের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব

চীনের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব

আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রভাব

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাব সমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতির প্রয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এর প্রভাব

১৯৭১-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী পরিস্থিতি ও সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক ভূমিকা

সহায়ক তথ্যসূত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থী পূনর্বাসন প্রেক্ষাপট

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে শরণার্থী পূনর্বাসন বিষয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি শরণার্থী পূনর্বাসন বর্তমান অবস্থা

অভ্যন্তরীণ উপজাতি উদ্বাস্তু পূনর্বাসন

উপজাতি শরণার্থী ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান প্রসঙ্গ

উপজাতি শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রসঙ্গ

সহায়ক তথ্যসূত্র

৭ অধ্যায় কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ ঃ লংঘন ও প্রতিবন্ধকতা

দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থা

জনগণের অংশগ্রহণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় কাঠামোর অভাব

স্থানীয় দলগত দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র সংঘাত

পার্বত্য চট্রগ্রামে চুক্তি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাব

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোয়েন্দা সংস্থা ও আমলাদের নেতিবাচক প্রভাব

সার্বজনীনতার অভাব

আঞ্চলিক পরিষদে চাকমা ও মারমাদের প্রাধান্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ

কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ বনাম ভোটের রাজনীতি

শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য পরিষদ আইন, ১৯৯৮

ক্ষমতা / শক্তির আধিপত্য

জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর মদদে মধ্যস্থত্বভোগী উপজাতি শ্রেণীর উদ্ভব

সুশাসনের অভাব ও সংখ্যালঘু ধারণা

বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও নব্য এলিট শ্রেণীর উদ্ভব

সহায়ক তথ্যসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

৮ম অধ্যায় মূল্যায়ণ

৯ম অধ্যায় উপসংহার

পরিশিষ্ট ঃ

পরিশিষ্ট ১ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির চুক্তি ।

পরিশিষ্ট ২ ঃ সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নপত্র

পরিশিষ্ট ৩ ঃ সাক্ষাত প্রদান কারীদের নাম

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

সূচনা

পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক যুগ ধরে চলে আসা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ উপায় নিরসন করে, পাহাড়ী উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বকীয় জাতিসত্ত্বা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালি ও উপজাতিদের সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সরকারের এই উদ্যোগকে ঘিরে পার্বত্যবাসীর ন্যায় সমগ্র দেশবাসীর ধারণা ছিল চুক্তিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া চুক্তি পরবর্তী সময়ে শান্তিবাহিনী সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদানের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহের সমাপ্তির একটি আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। স্বভাবতই তাই বিবিধ গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দল গুলোর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭' পরবর্তীতে 'শান্তিচুক্তি' নামে অধিকতর পরিচিতি পায়।

তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০০) যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, ঠিক সেই সময় সারাদেশের জাতীয় রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ইস্যুতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সরকার আর বিরোধীদলের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এর বিবিধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রতিফলিত হয়। বিরোধীদল, সংবাদ মাধ্যম, সুধীজন অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটিকে শান্তির জন্য আশাবাদী কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট মনে করেন নাই। অথচ ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ ও কৌশল নীতির যে আশ্রয় নেয়া হয়েছিল, তার ফলাফল ভাল হয়নি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির বদলে এটি ক্রমাগতভাবে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিষয়টিকে রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ও এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সফলতার সাথে যে কোন চুক্তি বাস্তবায়নের উপরই সেদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তা যখন শান্তি প্রতিষ্ঠার মতো একটি উদ্যোগ হয় তখন তা আরও অধিকতর গুরুত্ব পায়।[১] পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ হিসাবে শান্তিচুক্তি দেশ ও বর্হিবিশ্বে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে উপজাতিদের নিকট ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে, দীর্ঘদিনের সশস্ত্র বিদ্রোহের একটি রক্তপাতহীন পরিসমাপ্তির সূচনা বলে মনে করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের উদ্যোগ ছিল মূলত সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস। তবে শান্তিচুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও বাস্তবে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ এর অবকাঠামো ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট লিখিত নীতিমালার অভাবে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যকারিতা ব্যহত হয়েছে। যদিও পার্বত্য জেলা পরিষদ গুলো গঠিত হয়েছে কিন্তু প্রশাসনে পাহাড়ীদের অংশগ্রহণ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়নি। বরং চিরায়িত স্থানীয় সরকার ও জন প্রশাসনে জেলা পরিষদ গুলো একে অপরের সাথে তাদের কাজের সমন্বয় করতে পারছে না। অপরদিকে আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনে পরস্পরের সাথে ক্ষমতার প্রয়োগ ও প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক পরিষদ কার্যত অচল। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ভেদে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন প্রশ্নে মত ও নীতির পার্থক্য, সরকার বদল প্রভৃতি কারণে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রায়শই স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এ সকল কারণে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সরবরাহের দাবি বিগত এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক অবহেলিত হয়ে আসছে। তাছাড়া আমলা ও এলিট শ্রেণীর বিবিধ স্বার্থসমূহ, সেনাবাহিনী ইস্যু, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পাহাড়ে বসবাসরত পাহাড়ী উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যকার আস্থা ও বিশ্বাসের অভাবকেও চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম বাঁধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এখন প্রশ্নবিদ্ধ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চুক্তিটি সম্পাদন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল পরিবেশ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার যে আশা কিংবা সন্দেহের ধারণা করা হয়েছিল, স্বভাবতই চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার সার্থকতা নির্ভর করে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের যে সম্ভাবনা ছিল, স্বাভাবিক ভাবেই আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পাবর্ত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে।

গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও রাজনৈতিক দল গুলোর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি 'শান্তিচুক্তি' নামেও অধিকতর পরিচিতি পায়। তাই বর্তমান গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে শান্তি চুক্তি নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও পাহাড়ী জনগণ নিজেদের উপজাতি বলে মনে করেন না। অনেকে নিজেদের জুম্ম বা জুম্মা এবং পাহাড়ী বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। তাই আলোচ্য গবেষণায় পাহাড়ী শব্দটিরও ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা সমস্যা ঃ

শান্তিচুক্তির একটি অন্যতম প্রসঙ্গ হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করতে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯,২০,২১ নং আইন) এর

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার কথা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির গ অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নামে নতুন একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলত দুটি প্রশাসনিক কাঠামোর উপস্থিতি পাওয়া যায়, যার একটি চিরায়িত স্থানীয় সরকার এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হলে পাহাড়ীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত হবে এরূপ প্রত্যাশা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে উৎসাহিত করেছিল। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতিদের প্রাধান্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপজাতিরা আরও বেশী আশ্বস্থ হয়, আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতায়ন হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন হলে স্থানীয় পর্যায়ের বিবিধ সমস্যা সমূহ সমাধান করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পার্বত্যবাসীর অংশগ্রহণকে আরও সুদৃঢ় করা যাবে ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্থিতিশীল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা; স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; নিজস্ব উৎস হতে কর ও রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা প্রভৃতি বিকেন্দ্রীকরণের সুফল সমূহ অনুশীলনের সুযোগ তখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে যখন চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হবে। শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি স্থাপনে কতটুকু ফলপ্রসূ তা নির্ভর করে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতার অনুশীলন করতে পারছে কিনা তার উপর। অথ্যাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কীত। স্বভাবতই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ সময় (১৯৯৭-২০১৩) অতিবাহিত হবার পর গবেষণার মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রশ্নের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে?

সুদীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি সব সময়ই দেশ ও বিদেশের বহু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। প্রত্যেক গবেষকই তার অনুধাবনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে এটিকে যথার্থ করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গি, ভাব, বিবেচনার ভিন্নতা প্রত্যেককে তাদের মতামতের যেমন ভিন্নতা এনে দিয়েছে ঠিক তেমনি কিছু মৌলিক বিষয়ে গবেষকগণ একই রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Survey) করে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে নানাভাবে, নানা মাত্রায়। এছাড়া এই বিষয়ের উপর গবেষণা কালে শান্তি চুক্তির তত্ত্ব ও বাস্তবতার মাঝে ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটির বক্তব্য সমূহকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যেমন: পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত ও সংঘর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট;

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিবিধ মতামত; শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ; পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে চুক্তিটির দুর্বলতা সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিবিধ বিকল্প প্রস্তাবনা ইত্যাদি।

শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদৌ শান্তি আসবে কিনা তা নিয়ে প্রথম থেকে ছিল যথেষ্ট সংশয়। চুক্তির ব্যাপারে অনেকেই হতাশাও পোষণ করেছেন। তাদের মতে, শান্তিচুক্তি সংঘাত অবসানের মাধ্যমে শান্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে; কিন্তু স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। চুক্তি মানেই চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ। কেউ কেউ বলেছেন, মানবিক হৃদয়ের চুক্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে।[২] চুক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন, চিরতরে সংঘাত নিরসন না হবার তত্ত্ব।[৩] কারও মতে শান্তিচুক্তি মানেই স্থায়ী শান্তি নয়; শান্তির পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ।[৪] আবার কেউ বলেছেন, It was seeded with insecurity, discontent, inequality and further polarization [৫]। এমাজউদ্দিন আহমেদ 'শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সরকারের বৈধ কর্তৃত্বের বর্হিভূত বলে আখ্যায়িত করেন। তাছাড়া চুক্তিটিকে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে করেন।[৬]

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক ও গবেষকগণ বিবিধভাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল কারণ হিসাবে পাহাড়ীদের আত্মপরিচয়ের সংকটকেই দায়ী করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠী গুলোর আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বের প্রতি এক ধরণের হুমকি বোধ রাজনৈতিক সচেতনতার পথ প্রশস্ত করে। যাকে ভিত্তি করে শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণী জাতিগত জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করে। এখানে রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রের প্রবেশ গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব কাঠামো ভেঙ্গে দেয়।[৭] পার্বত্য সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে অনেক গবেষক ও প্রাবন্ধিক শুধুমাত্র ১৯৭১ পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানানোকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৮] স্বাধীনতা পূর্বে পাকিস্তান শাসনকাল সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের শোষিত হবার অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই উপজাতিরা সাংবিধানিক ভাবে স্বকীয়তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। ১৯৭১ এর পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশও জাতীয়তাবাদ বনাম সংখ্যালঘু উপজাতিদের স্বকীয় আত্মপরিচয়ের দাবিটি অবহেলিত হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্র বাঙালিদের নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, যদিও বাংলাদেশে ৪৫ ধরণের উপজাতি সম্প্রদায় থাকে। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, শেখ মুজিবর রহমান এর কাছে কত গুলো দাবি উপস্থাপন করেছিল। একজাতি বা আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাকে স্থায়িত্ব দিতে শেখ মুজিবর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবি সমূহ স্বীকার করে নেয়নি। এই ঘটনা উপজাতি সম্প্রদায় মেনে নেয়নি এবং ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করা হয়, যা সেই সময়ে পাহাড়ী জনগণের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে গণ্য হয়েছিল।[৯] তবে এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে (হারুন-অর-রশিদ:১৯৯৮) বলেন, শেখ মুজিবর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান ১৯৭১ পরবর্তীতে সবাইকে এক বাঙালি জাতীয়তাবাদে সংহতি প্রকাশ কেন জরুরী ছিল, তা ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বান ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ এবং জাতীয় সংহতির প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস।[১০]

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে ধরা হয়। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মকে বাংলাদেশের জাতীয় ধর্ম হিসেবে নেয়া হয় আর সেকারণে উপজাতিরা নিজেদেরকে নৃ-তাত্ত্বিক এবং ধর্মগত উভয় দিক থেকেই সংখ্যালুঘু হিসেবে আবিস্কার করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবি ছিল স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের দাবি গুলোকে যথাযথ মূল্যায়িত না করার পিছনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনের সময় ক্ষুদ্র উপজাতিদের স্বকীয়তার পরিচয়কে অবহেলিত করার প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছেন।[১১] অপরদিকে পার্বত্য উপজাতিরা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও ধারাবাহিক বৈষম্যের কারণে পাহাড়ীরা সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির শুরু। পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে এক ধরণের চাপা ক্ষোভের ও বঞ্চিত হবার যে আশংকা তৈরী হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় অপ্রাপ্তি ও বঞ্চণার এই স্থুল কারণ গুলোই তাদের বাধ্য করে সশস্ত্র আন্দোলনে যেতে।[১২] স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রত্যাখাত হওয়ার কারণও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের সশস্ত্র আন্দোলনের কারণ গুলোকে গবেষকগণ বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন, ঠিক তদ্রপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে 'শান্তিচুক্তি' সম্পর্কে তাদের মতামতের ভিন্নতা পাওয়া যায়। চুক্তিটিকে অনেকেই সার্বজনীন ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আখ্যায়িত করেছেন এই কারণে যে, চুক্তিটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোর মত পার্থক্যের কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি বজায় থাকছে না। জাতীয় ঐক্যমতের মাধ্যমে শান্তিচুক্তি না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়।[১৩] তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রামের অপরাপর তিনটি সংগঠন (পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন) শুরু থেকেই পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তিটির বিরোধিতা করে আসছে। তারা এটিকে দাসত্বের চুক্তি বলে মনে করে পার্বত্য চট্রগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবি করে আসছে।

অনেকে চুক্তিতে শান্তির কোন ব্যাখ্যা না থাকাকে শান্তি স্থাপনে চুক্তির সার্থকতা নিরুপনের সবচেয়ে বড় বাঁধা মনে করেন। চুক্তির কোথাও চুক্তির ফলে কিরূপ শান্তি স্থাপনের আশা করা হয়েছে তা বলা হয়নি। শান্তি বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এটি কি শুধুমাত্র বিদ্রোহী পাহাড়ীদের অস্ত্র জমাদানের বিষয়টির সাথে জড়িত, নাকি শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পাহাড়ীদের আত্মপরিচয়ে স্বাধীনভাবে বসবাসের ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।[১৪] চুক্তির কোথাও এই কথা বলা হয়নি যে, শান্তির জন্যই এই চুক্তি করা হয়েছে। তাই চুক্তিতে শান্তির সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন ছিল না। বরং শান্তিচুক্তি মুলতঃ বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত শান্তির একটি ধারণা মাত্র। তাই চুক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে এটি কতটুকু ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে তার বিচারে, শান্তির কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের বিচারে নয়।

এছাড়া যদিও চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য আলাদা কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই এবং চুক্তিতেও এরুপ কোন দিক নির্দেশনা নাই। তাছাড়া চুক্তিতে এই অঞ্চলে বাঙালিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ও পর্যায়ক্রমে বাঙালিদের পার্বত্য এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনার উল্লেখ নেই।[১৫]

কারও মতে, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা উল্লেখ না থাকাকে চুক্তির একটি দুর্বলতা মনে করেছেন। এছাড়া চুক্তি বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবকে চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের সমস্যা বলে মনে করেন।[১৬] অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে বলেন, নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা চুক্তিতে উল্লেখ না থাকাটা চুক্তি বাস্তবায়নে আরেকটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা। তাহলে জনসংহতি সমিতি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নে আরও চাপ প্রয়োগ করতে পারতো।[১৭]

বাঙালি ও পাহাড়ীদের মনস্তাত্ত্বিক বিরোধও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অন্তরায়। চুক্তিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা উপজাতিদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে যা পক্ষান্তরে বাঙালিদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ।[১৮] তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করে বাঙালিদের ২য় শ্রেণীর নাগরিকের মূল্য দেয়া হয়েছে বলে মনে করে থাকেন। তাই তারা সম অধিকার আন্দোলন শুরু করে এবং এটি রাজনৈতিক দল গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।[১৯] ফলে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। পাহাড়ী ও বাঙালিদের পারস্পরিক এই বিরোধের কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় হুমকি স্বরুপ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম একটি দুর্বলতার দিক হচ্ছে, শান্তিচুক্তিতে চাকমাদের প্রাধান্য। এটি যেন পাহাড়ী উপজাতি সমাজে চাকমা ও মারমা ব্যতিত অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী গুলোর ক্ষমতায়নের অধিকারকে খর্ব করে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রাক্কালে খাগড়াছড়ির তখনকার সাবেক স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য নক্ষত্র ত্রিপুরা বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে ৬ লাখ বাঙালি, আর ২ লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চাকমা সম্প্রদায়ের জন্য করা হয়েছে। এ চুক্তিতে শুধুমাত্র চাকমা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। এ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় অশান্তির আয়োজন করা হয়েছে।[২০] চুক্তিটি নানাভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, যেহেতু সংখ্যায় চাকমারা সবচেয়ে বেশি। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, আঞ্চলিক পরিষদে মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে ১ জন প্রতিনিধিত্ব এবং লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে ১ জন প্রতিনিধিত্ব রেখেছে। এরকম ছোট ছোট সম্প্রদায় গুলো থেকে মাত্র ১ জন প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করা হয়, যাতে করে অন্য সম্প্রদায় গুলো বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কেননা একজন বাঙালি, যেমন চাকমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হতে পারে না, ঠিক একইভাবে একজন চাকমাও পারে না ম্রং সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করতে। এটি আঞ্চলিক পরিষদে একটি মারাত্মক অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা।[২১] তবে চাকমা ও মারমাদের আনুপাতিক বৈষম্যের বিপরীত বক্তব্যও পাওয়া যায়। পার্বত্য জেলা পরিষদে চাকমাদের ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের ৪৪ শতাংশ জনসংখ্যা থেকে, সেখানে মারমা ও বাঙালিদের যথাক্রমে ৩২ ও ৩০ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। যা কিনা এককভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে চাকমাদের প্রতি এক প্রকার বৈষম্য।[২২] পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা রয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সংগ্রামে, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাই বেশী নির্যাতিত হয়েছে। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী, আঞ্চলিক পরিষদে চাকমা ও মারমা ব্যতিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য না থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা নয়। কেননা আঞ্চলিক পরিষদ যদি কার্যকর না থাকে, সত্যিকার অর্থে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নই না হয় তাহলে আঞ্চলিক পরিষদে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আনুপাতিক উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি মুখ্য বিষয় নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সংগ্রামের ইতিহাসে নারীদের অবদান পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সেভাবে মূল্যায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের শারিরীক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরুষেরা যখন বন্দুক নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে, নারীরা তখন পরিবার তথা সমাজকে সামলিয়ে রেখেছে। শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশের মাঝেও তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা সেনাবাহিনী দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়। ধর্ষণকে শত্রু ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী দুই ভাবে নারীদের চিহ্নিত করেছে। এক, শত্রু দলের সদস্য হিসেবে দুই, নারী হিসেবে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাঙালি কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতির ছায়া তিব্র ভাবে লেগেছে কারণ তারাও নারীর প্রশ্নে নিরব। আঞ্চলিক পরিষদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৩ জন তার মধ্যে উপজাতি নারী মাত্র ২ জন।[২৩] প্রায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন মেঘনা গুহ ঠাকুরতা তার 'The Chittagong Hill Tracts (CHT) Accord and After: Gendered Dimensions of Peace' প্রবন্ধে। তবে পৃথকভাবে অনুপাত নির্ভর হয়ে মহিলাদের আসন বিন্যাস করলেই যে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়ন হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বরং জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'I do not believe in woman empowerment; once the nation is empowered women would automatically be empowered'. তাছাড়া আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতি নারীদের জন্য ২টি পদ নির্দিষ্টকরণ করার মাধ্যমে উপজাতি নারীদের ক্ষমতায়নকে বরং পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। কেননা চুক্তির কোথাও বলা হয়নি, নারীরা আঞ্চলিক পরিষদের অনান্য পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না। বরং নারীরাও নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের অনান্য পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বা নারীদের আনুপাতিক বৈষম্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের প্রধান অন্তরায় নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন না হওয়ার অন্যতম কারণ মনে করেছেন, শান্তিচুক্তির লংঘনকে। মূলত শান্তিচুক্তি পরস্পরের মাঝে যে বিশ্বাস ও আস্থার সেতুবন্ধন করেছিল ক্রমান্বয়ে চুক্তির বাস্তবায়ন না হওয়া এবং চুক্তির লংঘন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের এত বছর পরও শান্তি স্থাপন না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হতে পারে চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না হওয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতা না দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, Hill District Council, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন এবং সেনাকর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় উপজাতিদের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশা কাজ করছে। বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়নে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং এটা সংঘাতের অন্যতম একটা উৎসে পরিণত হয়েছে।[২৪] অতীতেও আমরা দেখেছি যে, ১৯৮৯ সালে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল মূলতঃ তাদের পক্ষে ক্ষমতায়ন না থাকায়। পার্বত্য জেলা পরিষদ গুলোর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, জনস্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত থাকলেও ভূমি সমস্যা, উদ্বাস্তু পুর্নবাসন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের ক্ষমতায়নকে খর্ব করা হয়েছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়নি। ঠিক তেমনি চুক্তি পরবর্তীকালে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হয়নি।[২৫] কারও মতে, সরকার চুক্তি লংঘন করার মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদকে দুর্বল করে রেখেছে। আঞ্চলিক পরিষদ একটি বিশেষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক সংগঠনের মত স্থানীয় সংগঠনেরও উচিত যথাযথ প্রশাসনিক এককের মধ্য দিয়ে কাজ করা এবং মন্ত্রিবর্গের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের প্রতি দায়বদ্ধ যেটা বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সামাজিক অনুশীলনের বিপরীতে অবস্থান করে।[২৬] পার্বত্য চট্টগ্রামে একই সাথে বিবিধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন সেনাবাহিনী, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, আঞ্চলিক পরিষদ এবং প্রথাগত পাহাড়ী শাসন ব্যবস্থা একে অপরের সাথে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতায় শান্তি স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।[২৭] তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর করতে দীর্ঘ সময়ের প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক এবং চলমান নিয়ম নীতি পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের জন্য নতুন প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক নকশা তৈরিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতার অভাব রয়েছে। এই কার্যাবলি সম্পাদন, সেবা প্রদান, সংগঠন পরিচালনা আচরণে বৈচিত্রতা আনয়নের জন্য নিয়ম নীতি প্রয়োজন। অথচ এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ এবং নিয়মের সাথে একটা পুরো নতুন ব্যবস্থাপনা আনা হয়নি।[২৮]

আপাত দৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্থানীয় উপজাতি নেতাদের সন্তুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে পারলেও ঐ এলাকায় স্থিতিশীল শান্তি আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপজাতিরা বুঝতে পারছে, এই চুক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের নেতৃস্থানীয় কিছু উপজাতি ক্ষমতা, পদ ও সম্পদের অধিকারী হয়েছে। এভাবে উপজাতিদের মধ্যে অন্তর্গত কোন্দল, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিয়েছে।[২৯] তাছাড়া স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সেনাবাহিনীর ব্যবহার; ভূমি অধিগ্রহণ; মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার; স্থানীয় উপজাতি নেতাদের হয়রানি; অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুর্নবাসন না হওয়া, সমতলবাসী বাঙালিদের জন্য বিনামূল্যে রেশন প্রদান ও অবৈধ ভাবে জমির ইজারা প্রদান প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ।[৩০]

সুতরাং, উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আপাত দৃষ্টিতে সশস্ত্র বিদ্রোহের তৎপরতা দেখা না গেলেও সেখানে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসেনি। এমতাবস্থায় বিভিন্ন গবেষক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিকল্প প্রস্তাবনা ও বিবিধ পরামর্শের কথা বলেছেন। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা বিভাগ ঘোষণা, পার্লামেন্টে আসন সংরক্ষণ, তিন পার্বত্য জেলার স্বতন্ত্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন, উপজাতিদের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, পাঠ্যপুস্তকে পাহাড়ী জাতি সমূহের ইতিহাস তুলে ধরা, স্থানীয় সরকার পরিষদে গণতন্ত্রায়ন, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান হতে উপনিবেশবাদী আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা পরিহার ইত্যাদি।[৩১] পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় যে সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হয় ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া। আবার কেউ বিকল্প প্রস্তাবনা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে 'Bottom Up Approch' এর কথা বলেন।[৩২] অনেকের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্যসার মতো জাতীয় একটি সমস্যা অবশ্যই সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী গুলো রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায় অথচ সংসদে আলোচনা করতে আগ্রহী হয় না। সংসদে পার্বত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ফলে রাজনৈতিক দল গুলোর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। সেজন্য সংলাপের আয়োজন করে সার্বজনীন ঐক্যমতের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানে আগ্রহী হওয়া উচিত।[৩৩] কেউ আবার, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে শান্তিচুক্তির বিকল্প হিসেবে নরওয়েজিয়ান সামি (Sa'mi Parliament) মডেলের উল্লেখ করেছেন। সেখানে সামি আদিবাসিরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যা নরওয়েতে তাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল মোর্চা গঠনের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপজাতিদের আলাদা ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে উপজাতিদের জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের সুযোগ আছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে নরওয়েজিয়ান সামি মডেলের আলাদা কোন প্রয়োজন নেই। বরং আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়ন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ ত্যাগ করে শান্তিচুক্তি করতে কেন অনুপ্রাণিত হয় ? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চুক্তিটিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের করা হয়েছে। শান্তিচুক্তির একটি অন্যতম প্রসঙ্গ হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী জেলা পরিষদ গুলো গঠিত হয়েছে তথাপি স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়নি, পাহাড়ীদের প্রশাসনে অংশগ্রহণ ও তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়নি। বরং স্থানীয় সরকার ও জন প্রশাসনে জেলা পরিষদ গুলো তাদের কাজের সমন্বয় করতে পারছে না। চুক্তি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান, সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, এনজিও'দের কার্যাবলির সমন্বয়, ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পদনের ক্ষমতা দেওয়ার কথা থাকলেও আঞ্চলিক পরিষদ কি উপায়ে অন্যান্য সরকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার কাঠামোর সাথে তাদের ক্ষমতার ভাগাভাগি করে উপরোক্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করবে তা সরকার নিয়ম নীতির অধীনে স্পষ্ট করেনি। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় সরকার এবং অপরাপর সরকার কাঠামো গুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংশয় বিদ্যমান, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাঁধাগ্রস্থ করছে। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব না করেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অনুশীলন, উন্নয়ন তদারকি প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; Hill District Council, স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং সেনাকর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত করছে। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিকট ক্ষমতার বন্টনের যে প্রয়াস ছিল, বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন হয়নি। এছাড়া চুক্তির আওতায় অলিখিত শর্তে বন্দি মুক্তি এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ হয়নি। উপরোন্ত, স্থানীয় জন প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের উপর উল্লেখযোগ্য ভাবে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব রয়ে গেছে। পাহাড়ে অবস্থিত উপজাতিদের ভূমির দাবি চুক্তির আওতায় ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের সুপারিশ ছিল। কিন্তু ভূমি সংস্কার কমিশন গঠিত হলেও ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। তাছাড়া ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের মাঝে ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় উপজাতিদের ভোটার তালিকা তৈরী করে নির্বাচনের মাধ্যমে জন প্রতিনিধিদের দ্বারা পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়ায় স্থানীয় উপজাতিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরও উল্লেখিত সমস্যা সমূহের

Dhaka University Institutional Repository

আশানুরুপ অগ্রগতি না হওয়ায় পার্বত্য উপজাতিদের মাঝে ক্রমশ হতাশা ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আপাত দৃষ্টিতে সশস্ত্র বিদ্রোহের তৎপরতা দেখা না গেলেও সেখানে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসেনি।

শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সমস্যা সমূহকে সমাধানের আওতায় আনা সম্ভব না হলেও চুক্তির কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা পরিলক্ষিত করি। চুক্তি বাস্তবায়নের পর শান্তিবাহিনী সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদান করে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত হয়। পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নেয়া উপজাতি শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার পথ সুগম হয়। দেশ ও বিদেশে শান্তি স্থাপনে সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংশিত হয়।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সহায়ক উপায়। পৃথিবীর বহু দেশে ক্ষমতাকে বন্টনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদাহারণ আছে। ঠিক তেমনি পার্বত্য সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটি একক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দৃশ্যত সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়িত করে পাহাড়ী উপজাতিদের মাঝে শান্তি স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে সকল সুফল রয়েছে যেমনঃ নির্বাচন, অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জন নিরাপত্তা, নিজ জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধিকার সমূহ পাহাড়ীরা অনুশীলন করতে পারছে কিনা তার উপর শান্তিচুক্তির সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। স্থানীয় পাহাড়ীদের এই সকল অধিকারের অনুশীলন তাদের মধ্যকার নিরাপত্তার সংকটকে দূর করতে পারতো। যার ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো । অর্থাৎ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করা প্রয়োজন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে?

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণা বিষয়বস্তুর উপরোক্ত সাধারণ বর্ণনার প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপ ঃ

প্রথমত, আমার গবেষণা কর্মটি যাতে সারা বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের জন্য জাতিগত সমস্যা নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উদাহারণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে সেই লক্ষ্যে গবেষণা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। আমার গবেষণা কর্মটির সমাধান ও সিদ্ধান্ত সমূহ একটি চুক্তি বাস্তবায়নের ও অনুশীলনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিধায় এটি অনেক বাস্তবধর্মী । কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পর প্রায়োগিক ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের বাঁধা, লংঘন, সীমাবদ্ধতা, প্রস্তাব প্রভৃতি মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যালোচনা করা । তাছাড়া সাক্ষাতকার গ্রহণের মতো সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ফলে গবেষণা সমস্যার সমাধানটি পরবর্তীতে নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করতে পারবে ।

দ্বিতীয়ত, একটি দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অভিন্ন সুফল পেতে হলে জরুরী হলো জাতীয় ঐক্য বিধান। জাতীয় ঐক্য একটি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে তরান্বিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকালে তদানীন্তন প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো (বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও জাতীয় পার্টি) চুক্তিটির বিরোধিতা করে আসছিলো। চুক্তিটি সম্পাদনকালে এটি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি। তাছাড়া সরকার চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিষয়টি নিয়ে সংসদেও আলোচনা করেনি। জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর মাঝে এমন মতানৈক্যর কারণে সরকার বদলে হলে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন স্থবির হয়ে পড়ে। সুতরাং শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জাতীয় ঐক্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠার মতো অভিন্ন স্বার্থকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যে বিষয় গুলোতে মত পার্থক্য রয়েছে সেগুলো গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি জাতীয় সংহতি (National Integration) তৈরী করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী- বাঙালিদের ঐক্য ব্যতিরেকে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় শান্তি চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য উপজাতিরা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্ব পরিচয়ের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, গবেষণার মাধ্যমে পার্বত্য উপজাতিদের আত্বপরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি পাহাড়ী- বাঙালিদের জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখতে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণে নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করা।

চতুর্থত, চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যেগ। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফলসমূহ তথা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে পার্বত্য উপজাতিদের অংশগ্রহণ কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষন করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে জনসংহতি সমিতি সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করা এবং কি কি বিষয় চুক্তি বাস্তবায়ন না করার পিছনে সরকারকে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা অনুসন্ধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত, স্বভাবতই একটি চুক্তি সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, সর্বমহলের আস্থা অর্জন করতে পারে না। বরং চুক্তিটির বাস্তবায়ন ও কার্যকরিতার মধ্য দিয়েই এর ত্রুটি ও অসংগতি গুলো ধরা পড়ে। গবেষণার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বাঁধা, অসংগতি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান অনুসন্ধান করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

স্বাভাবিক ভাবেই একটি চুক্তি সকলের আস্থা, মতামত, চাওয়া-পাওয়ার হিসাবকে একসাথে ধারণ করতে পারে না। মূলত ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় থেকেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০০) চুক্তিটি ঘিরে উচ্ছ্বসিত আশাবাদ ব্যক্ত করলেও বি.এন.পি. জামায়াত ইসলাম প্রভৃতি বিরোধীদল সমূহ চুক্তির বিরোধিতা করে। কিন্তু চুক্তিটির ভবিষ্যত সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কোন পক্ষই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবিধ সমস্যা সমাধানে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তিচুক্তি কি ধরণের ভূমিকা রাখবে। চুক্তি সম্পাদনকালে পরস্পর বিরোধী ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণার ভিত্তিই ছিল স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সন্দেহ আর সংশয়ে ভরা কিছু অনুমিত ধারণা। সময়ের পরিক্রমায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার করেছে প্রায় ১৬টি বছর (১৯৯৭-২০১৩)। সুদীর্ঘ এই সময়ে চুক্তিটি পার করেছে আওয়ামী লীগ শাসনামল (১৯৯৬-২০০০); (২০০১-২০১৩); চারদলীয় জোট সরকার (বি.এন.পি-জামায়াত জোট) (২০০১-২০০৫); তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৬-২০০৮) সমূহের শাসনকাল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় চুক্তির বাস্তবায়ন মূল্যায়ণ পূর্বক চুক্তিটির সফলতা ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয় করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে কতুটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা মূল্যায়ন প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের একটি যোগসূত্র বিদ্যমান। কেননা আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন হলে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে পাহাড়ীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে পার্বত্য উপজাতিরা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করতে পারলে পাহাড়ীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চণাকে প্রশমিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও চুক্তির লংঘন সমূহ প্রভৃতি কিভাবে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নকে খর্ব করে শান্তি স্থাপনে বাঁধা সৃষ্টি করছে তা নির্ণয় করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এই গবেষণা খুবই সময়য়োপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ব্যতিরেকে শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবিধ সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তি উপজাতি ও বাঙালি উভয়ের আস্থা ও প্রাপ্তি পূরণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তার মূল্যায়নপূর্বক এর প্রভাব ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা নির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন।

গবেবণা অনুমিত ধারণা ঃ

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ, জার্নাল, রিপোর্ট, সংবাদপত্র-সাময়িকী, সীমিত আকারের পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার অনুমিত সত্য সমূহ নিরুপ ঃ

১। সরকারের আগ্রহ ও সদিচ্ছার অভাবেই চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অন্যতম বাঁধা। সরকারের কেন্দ্রীভূত কতৃত্বের প্রবণতা, সরকার ও রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা ভাগাভাগি না করার মানসিকতা, আমলাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব, প্রশাসনিক অসহযোগিতা প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে বাঁধাগ্রস্থ করে। আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় সরকার সাথে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতার অংশীদার সমন্বয় করে কাজ পরিচালনা করবে তার সুস্পষ্ট ও লিখিত নিয়ম নীতির স্বচ্ছতার অভাব আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যত অচল করে রেখেছে। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন প্রশ্নে সরকারের এরুপ অনাগ্রহের ফলশ্রুতিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের স্থানীয় সুফল সমূহের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপিত হয়নি।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটের রাজনীতি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে। বর্তমানে উপজাতি ও বাঙালির আনুপাতিক হার প্রায় (৫২:৪৮) সমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিদের এই আনুপাতিক হার সংসদে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলো সরকার গঠনের অভিপ্রায়ে বাঙালি ও চুক্তি বিরোধী পক্ষের জনগণকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয় না। চুক্তি বাস্তবায়নের অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বিস্তার করেছে। রাজনৈতিক দল গুলো দলের পদ ও প্রার্থী মনোনয়নে দলীয় আনুগত্যকে গুরুত্ব দেয়। পরবর্তীতে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ, সরকারী প্রশাসনে নিয়োগ, উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় উপজাতি সমাজে সরকার সমর্থিত একটি শ্রেণী সমাজ গড়ে তোলে। যারা আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নে আগ্রহী হয় না। বরং সরকার গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ উপজাতিদের মাঝে প্রচার করে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের দাবিকে দূর্বল করার চেষ্টা করে। ফলে সরকারও আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত রাখার সুযোগ পায়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, উপদল গুলোর পারস্পরিক আস্থার অভাব, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দোষারোপ, অপহরণ, গুম, হত্যা, পরস্পরের উপর ভারী অস্ত্রের ব্যবহারের মতো ঘটনা পাহাড়ীদের সশস্ত্র সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আঞ্চলিক দল ও উপদলীয় কোন্দল ও সশস্ত্র সংঘাতকে ঘিরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি এখন সুদূর পরাহত।

৫। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর ঐক্যমত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালিদের ঐক্য ব্যতিরেকে সম্পাদিত হওয়ায় শান্তিচুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণাটিতে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা কর্মটির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস ঃ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর সমস্যার পরিধি ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ও সিভিল সোসাইটির নেতৃবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া সাক্ষাতকার ও প্রশ্নপত্র তৈরী, বিভিন্ন উপজাতি সংগঠনের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কিত সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে পাহাড়ী-বাঙালি নেতৃবৃন্দ, জাতীয় শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও মতামতকে গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক উৎস ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ থেকে উপাদান, উদ্ধৃতি, সরকারের গেজেট সমূহ, গবেষণা জার্নাল, সাময়িকী, সভা-সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, রিপোর্ট, থিসিস ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম ও সংবাদ প্রভৃতি উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত করার পর সেগুলোকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

তদুপরি, গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত দেশী-বিদেশী গ্রন্থ, গবেষণা কর্ম, রচনা, প্রবন্ধ, সরকারী দলিল, জার্নাল ইত্যাদির প্রতিটি তথ্য, উপাত্ত, দলিলের অধ্যায় ভিত্তিক সূত্র ও বইয়ের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা সীমাবদ্ধতা ঃ

আলোচ্য গবেষণায় তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার বাস্তবতা মেনে নিতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধাবলী সহজলভ্য হলেও সমসাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণ অপ্রতুল। অধিকাংশ গবেষক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হতে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই সরকারী পৃষ্ঠপোশকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির পক্ষে জয়গান করেছেন। এদের অনেকেই সরকারী ব্যয়ে অথবা সেনাক্যাম্পের আতিথেয়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে এসে, যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তার সবই প্রায় ভ্রমণকাহিনীর মতো, যেমন 'ঘুরে এলাম, দেখে এলাম' এই প্রকৃতির। অনেক প্রবন্ধ, ম্যাগাজিনে ঘটনার বর্ণনাকে প্রায়শই অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, গবেষণাকালে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত গবেষণা গ্রন্থের অভাব ছিল। পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার সাধারণ জনগণের মত প্রকাশে সন্দিহান দৃষ্টি ও ভীতিসহ এমন কিছু বিষয় ছিল যা গবেষণার স্বাভাবিক বিকাশকে বাঁধাগ্রস্থ করেছে। কর্মজনিত বিধি নিষেধের কারণে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। মাঠ পর্যায় থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের কারণে তথ্য প্রদানকারীরা গবেষকের নিকট তথ্য প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তদুপরি যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে বিনয়ের সঙ্গে তাদের ইচ্ছা ও সময় অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য গুলোর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায় পরিকল্পনা ঃ

'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ একটি মূল্যায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে ১ম অধ্যায়ে বিবিধ গ্রন্থ প্রবন্ধের উপর সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার সমস্যা, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা সীমাবদ্ধতা সমূহ বিবৃত করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, সংকট সমূহ থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষাপট সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে গবেষণাটির একটি তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার প্রেক্ষাপট বিবৃত করার সাথে সাথে সাম্প্রতিক সময়ে ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। উপজাতিদের মধ্যে তাদের ভূমির অধিকার নিশ্চয়ত া ব্যতিরেকে যে পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তা তথ্যবহুল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা, অস্থায়ী সেনা-ছাউনী প্রত্যাহার না করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কৃর্তক কিভাবে উপজাতিদের নিরাপত্তার অধিকার বাঁধাগ্রস্থ করছে তা আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী শরণার্থী পুনর্বাসিত না হওয়া ও শরণার্থী সমস্যা সমাধান না হওয়ায় কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে অন্তরায় তা তুলে ধরা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাক্ষাতকার গ্রহণ ও মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের প্রধান বিষয়াবলীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ কিভাবে কার্যকর হয়নি তা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ৮ম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটির একটি সার্বিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজস্ব ধারণা সমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিশেষে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকারণ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত না হওয়ায় পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ৯ম অধ্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সমাপ্তিসূচক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. Chowdhury, N. J. (2009). The Chittagong Hill Tracts Accord Implementation in Bangladesh : Ideals & Realities. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, *Volume : XXV*No 2.

২. আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৭)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়েরর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা*। পৃ -১৩, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

৩. Nazneen, D. A. (1996). Conflict Resolution Approach: The Case of Srilanka and Bangladesh. *Social Science Review*, *Vol. XIII,*No 2. University of Dhaka : Dhaka.

৪. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*। ঢাকা : সন্দেশ।

৫. Mohsin,A. (1997).*The Politics of Nationalism: the case the Chittagong Hill Tracts.* Dhaka : The University Press Limited.

৬. আহমেদ, এমাজউদ্দিন (১৯৯৮)। *শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা : ইনফ্রো পাবলিকেসন্স।

৭. Chakma, B. (2008). Assessing the Chittagong Hill Tracts Peace Accord. Asian Profile 36 (1), 93-106.

৮. Mohsin,A. (1997). op.cit.

৯. Mohsin, A.(1998). Chittagong Hill Tracts Peace Accord: Looking Ahead. *Journal of Social Studies*, August - October, p-104-117.

১০. রশিদ, হারুন-অর (১৯৮৯), জাতীয় সংহতির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্রগ্রাম সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ, ঢাকা। দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭-২০ জুলাই)।

১১. Mohsin, A. (1997). op.cit.

১২. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। op.cit.

১৩. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). The Elusive Peace Accord in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and the Plight of the Indigenous People. In N.Uddin (Ed.), *Politics of Peace* (A Case of the Chittagong Hill Tracts ed., 185-185). Dhaka: Institute of Culture & Development Research.

১৪. Uddin, N.(2012). Paradox of Peace-building in the Chittagong Hill Tracts. In N.Uddin (Ed.), *Politics of Peace* (A Case of the Chittagong Hill Tracts ed., 199-199). Dhaka: Institute of Culture & Development Research.

১৫. *Ibid p197*

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Mohsin, A. (2003).*The Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : on the Difficult Road to Peace*. Colorado : Lynne Rienner Publishers.

১৭. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

১৮. আহমেদ, এমাজউদ্দিন (১৯৯৮) । op.cit.

১৯. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

২০. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯) । op.cit.

২১. Mohsin, A. (2012). The Elusive Peace Accord in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and the Plight of the Indigenous People. In N.Uddin (Ed.), *Politics of Peace* (A Case of the Chittagong Hill Tracts ed., 65-66). Dhaka: Institute of Culture & Development Research.

২২. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

২৩. Mohsin. A. (2012). Gendered Nation, Gendered Peace. Dhaka.

২৪. Chowdhury, N. J. (2009). op.cit.

২৫. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

২৬. Chowdhury, N. J. (2009). op.cit.

২৭. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

২৮. Chowdhury, N. J. (2009). op.cit.

২৯. Uddin, N.(2012). op.cit.

৩০. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

৩১. Mohsin, A. (2003). *op.cit.*

৩২. Uddin, N.(2012). op.cit.

৩৩. Jamil, I., & Panday, P. K. (2012). op.cit.

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা গুলোকে বুঝতে হলে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা বিবৃত করা প্রয়োজন। স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে স্বাধীনতাত্তোর সময়ের বিবিধ সরকার সমূহের শাসনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমূহ সমাধানে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলোর বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই সরকার কর্তৃক আরোপিত। আর তাই সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গুলো পার্বত্য উপজাতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি। দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চণা ও পাহাড়ীদের দাবি-দাওয়া গুলো সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কালক্রমে পাহাড়ীদের এই সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে এমনকি সামরিক কৌশল প্রয়োগ করা হয়, যাতে হিতে বিপরীত হয়। বরং পাহাড়ীরা তাদের দাবি আদায়ে আরও সশস্ত্র হয়ে উঠে। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুলো বিশদভাবে উপস্থাপন করা হলো।

স্বাধীনতা পূর্ব প্রেক্ষাপট :

পার্বত্য বিদ্রোহ একদিনে কিংবা একটি মাত্র ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়নি। পাহাড়ে বসবাসকারী শান্তি প্রিয় মানুষের বিদ্রোহী হয়ে উঠার পেছনে একটি নয় অনেক কারণ রয়েছে। মূলত ষাটের দশকে দানা বেঁধে ওঠা পার্বত্য বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন সত্তর দশকে শাসক গোষ্ঠীর অবিমিষ্যকারীতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়, তখনই আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে সংকট গুলো ভেসে ওঠে। ব্রিট্রিশরা যেরুপ 'ভাগ করো' এবং 'শাসন করো' নীতি গ্রহণ করে শাসন করেছিল তদ্রুপ পাকিস্তানীরাও জলবিদ্যুতের নামে বাংলাদেশকে আলোকিত করার নামে পাহাড়ীদের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।[১] ১৯৬০ সালে পাকিস্তান কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ স্থাপন করলে পাহাড়ীদের আবাদি জমি এবং বাড়িঘর; ৫৪০০০ একর বা ৩৫০ বর্গমাইল উর্বর জমি (যা ছিল সে সময় পার্বত্য এলাকার চাষযোগ্য ভূমির শতকরা ৪০ ভাগ) পানিতে নিমজ্জিত হয়। ফলে ১৮০০ পরিবারের প্রায় ১০০০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এভাবে কাপ্তাই বাঁধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীদের মাঝে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক সামাজিক ক্ষোভ।

এছাড়া পাকিস্তান আমলে আরও কিছু কার্যক্রম নেয়া হয় যাতে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মাঝে শোষণ, বঞ্চণা ও নিপীড়নের চিত্র স্পষ্টত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে কর্ণফুলী পেপার মিল তৈরী করে পার্বত্য সম্পদের ব্যাপক ও একচেটিয়া ব্যবহার শুরু হয় অথচ স্থানীয় পাহাড়ীদের কর্মসংস্থান সেখানে হয়নি। পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় করে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে যন্ত্রাংশ ক্রয়ে এবং বাকী টাকা ব্যয় হয় কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত করতে। কর্ণফুলী পেপার মিল চালু হলে সেখানে ১০ হাজার চাকরির সুযোগ তৈরি হলেও মাত্র ১০-

Dhaka University Institutional Repository

২০ জন পাহাড়ী সেখানে নিু শ্রেণীতে কাজের সুযোগ পায়। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে মোট চাষাবাদ যোগ্য আবাদী জমির ৪০ শতাংশ এই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সময় ১৯৬৪ সালে একটি কানাডিয়ান সার্ভে কোম্পানী (Forestal Forestry and Engineering International Ltd.) তাদের সার্ভেতে পার্বত্য চট্রগ্রামের মাত্র ৩.২ শতাংশ জমিকে ধানী চাষাবাদযোগ্য জমি বলে চিহ্নিত করে।[২] আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোকে পূণর্বাসন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে হাজারো ভূমিহীন পরিবার। এছাড়াও স্বাধীনতা পূর্বে পার্বত্য চট্রগ্রামের বেতবুনিয়াতে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র তৈরীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্রগ্রামে বিদেশী বিনিয়োগ (Canada International Development Agency -CIDA) প্রতিষ্ঠা পায়। বেতুবনিয়ার ভূ-উপগ্রহের কাজ শেষ হয় ১৯৭৮ সালে এবং এই ভূ-উপগ্রহ নির্মাণের কারণে মারমা সম্প্রদায়ের অনেককে তাদের বাসস্থান ছাড়তে হয়।[৩] এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্বে পাকিস্তান শাসনকালে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। স্বভাবতই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তাদের দাবি-দাওয়া গুলো নিয়ে পাহাড়ীরা নুতন করে আশা করতে শুরু করে।

স্বাধীনতাত্তোর প্রেক্ষাপট:

শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫):

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধান ও বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ২৪ শে এপ্রিল মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা পাহাড়ীদের দাবি সংবলিত নিোক্ত দাবি গুলো বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণেতাদের কাছে পেশ করেন। তার মূল দাবি গুলো ছিল -

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা ও এর নিজস্ব একটি আইন পরিষদ থাকবে।
- পার্বত্য আদিবাসী জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।
- পার্বত্য আদিবাসী রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।[৪]

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সংবিধানে কোন বিধান এবং বাজেটে কোনরূপ বরাদ্দ ছিল না। উপরোন্ত আওয়ামী লীগ সরকার এক সংস্কৃতি ও এক ভাষা নীতি নেয়ার ফলে উপজাতিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। শেখ

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবর রহমান তাঁর প্রথম ও শেষ পার্বত্য সফরে গিয়ে ১৯৭৩ সালে রাঙামাটির এক জনসভায় বলেন, 'From this day onward the tribals are being promoted into Bengalis' ।[৫] এ প্রসঙ্গে এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ কথা সত্যি যে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রবর্তিত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নামে পরিচিত হইবেন"- এ কথা বলা হয়েছিল" । স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বান ছিল সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ এবং জাতীয় সংহতির প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস ।[৬] কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলে তা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশীদের ন্যায্য দাবিসমূহের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ধারাবাহিকতায় এটি স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হয়। তদ্রুপভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে তাদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার ঘোষণায় উপজাতিরা তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার প্রশ্নে ভীত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে যা উপজাতিদের সশস্ত্র বিদ্রোহে যেতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে শরদিন্দু শেখর চাকমা বলেন, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো বাঙালিরা ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতিত-শোষিত হয়েছিল। এখন তারা নিজেরাই পাহাড়ী এবং দেশের সংখ্যালঘু উৎপীড়ণকারী ।[৭]

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নিম্নোক্ত স্থূল কারণ গুলোই পাহাড়ে অবস্থিত উপজাতিদের সশস্ত্র আন্দোলনে যেতে বাধ্য করে -

- সংবিধান ও বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নীরবতায় উপজাতিদের বঞ্চিত হবার ধারণা ।
- মানকেন্দ্র লারমার দাবি অনুযায়ী সংবিধানে তা প্রতিফলিত না হওয়া ।
- শেখ মুজিবের বাঙালি হয়ে যাবার ঘোষণা / আওয়ামী লীগ সরকারের এক সংস্কৃতি ও এক ভাষা নীতি ।
- ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর দীর্ঘকাল পার্বত্য চট্টগ্রামে উপস্থিতি পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে আতংকিত করে তোলে ।
- সাংবিধানিক পথে (সংসদে উপস্থাপন Parliament debate, ১৯৭৩ : ৬৬২-৬৬৩) উত্থাপিত পাহাড়ীদের দাবিকে গুরুত্ব না দেয়া ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী গঠন:

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৭২ সালে ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন । ১৯৭২ সালেই দেখা দেয় আরেক নতুন তরুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা প্রীতিকুমার চাকমা, যিনি আবার সক্রিয় করে

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী খাগড়াছড়ির ইটছড়ির জঙ্গলে বিকশিত হয় "শান্তিবাহিনী" পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা।[৮]

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৭-১৯৮০) :

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমন করতে পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকারের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক বিবেচনার চেয়ে সামরিক বিবেচনায় বিষয়টি সমাধানে অধিকতর গুরুত্ব পায়। জিয়াউর রহমানের শাসনকালে চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে সমাধানের লক্ষে কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলো পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাঙামাটি শহরে উপজাতি নেতাদের সাথে জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভায় মিলিত হোন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে 'Tribal Convention' নামে বিদ্রোহীদের বিকল্প শক্তি হিসাবে পাহাড়ীদের একটি সংগঠন গড়তে পৃষ্টপোষকতা করেন। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (Chittagong Hill Tracts Development Board) গঠন করেন। এই বোর্ড সামাজিক সুবিধাদির ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপাসনালয় নির্মাণ সহ বহুবিধ পদক্ষেপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ, ট্রাইবাল কালচারাল ইনস্টিটিউট (Tribal Cultural Institute) প্রতিষ্ঠা করেন। উপজাতিদের মধ্যে থেকে (বিনিতা রায়, সুবিমল দেওয়ান, অং শু প্রু চৌধুরী) সরকারের উপদেষ্টা / মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সময় যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী গুলো গ্রহণ করা হয় তা পাহাড়ীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে উপজাতিদের বঞ্চিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা, স্বাধীন বাংলাদেশেও উপজাতিরা সহজে গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরা এখন উন্নয়নের কথা বললে ভয় পায়। কারণ এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের যতো বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, কোনটাই তাদের উপকারে আসেনি; বরং তাদের ক্ষতি হয়েছে। তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জায়গা-জমি হারিয়েছে, তবে কিছু বাঙালির উন্নতি হয়েছে।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিয়াউর রহমান মূলতঃ দুটি বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র সেনা ছাউনী স্থাপন এবং দ্বিতীয়ত, সমতল ভূমি থেকে দরিদ্র বাঙালি জনসাধারণকে নিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসনের ব্যবস্থা করলেন।[১০]

জিয়াউর রহমানের আমলে Far Eastern Economic Review এর ১৯৮১ সালের জুন মাসের সংখ্যায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে উদ্ধৃতি করে লেখা হয়, "President Ziaur Rahman frankly

Dhaka University Institutional Repository

admitted that the Dhaka Authorities were planning to settle between 2,00,000 and 3,00,000 in the Chittagong Hill Tracts." এ প্রসঙ্গে নুসরাত জাহান চৌধুরী বলেন, the government sponsored migration programme, grabbing lands for Bengali settlers and other purposes agitated the tribal people and they started armed rebellion against the government of Bangladesh. [১১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমানের নীতি ছিল সামরিক, অর্থনৈতিক, কুটনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের পূনর্বাসনের নামে পাহাড়ীদের সমতল ভূমি সরকার অধিগ্রহণ করে নেয়। ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই পাবর্ত্য চট্টগ্রামে চাষাবাদ যোগ্য ভূমির অভাব ছিল। উপরোন্ত পাহাড়ীদের জমি-জমা অধিগ্রহণ করে বাঙালিদের বসতি স্থাপনে সরকারের পৃষ্টপোষকতার কারণে পাহাড়ীদের মাঝে হতাশা, অবিশ্বাস ও অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতারণামূলক অজুহাত দেখিয়ে ১৯৭৯ সাল থেকে কয়েক বছরে দেশের সমতলের বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চার লক্ষাধিক বাঙালি পরিবারকে পূণর্বাসিত করা হয় মূলত পাহাড়ীদের ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির ওপর।[১২]

এরশাদের শাসনকাল (১৯৮৩-১৯৯০):

জিয়াউর রহমান পরবর্তী সময়ে এরশাদের আমলেও (১৯৮৩-১৯৯০) পার্বত্য সমস্যাকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ নিলেও পাশাপাশি পাহাড়ীদের আস্থা অর্জনের জন্য বহুবিধ অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank), ইউ,এন,ডি,পি (UNDP) এবং ইউনিসেফ (UNICEF) এর সাহায্যে ৪৫৬ কোটি টাকার শতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৪-৮৫) থেকে (১৯৮৯-৯০) আওতায় সরকার ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করে। তবে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি উন্নয়ন হলেও পাহাড়ীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। কেননা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালিরা উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করে তাদের পক্ষে নিয়েছে এবং যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের ঠিকাদারি, সরবরাহ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে একচ্ছত্র ভাবে সুবিধা পেয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম পাহাড়ীদের চাহিদা প্রয়োজন অনুসারে নেওয়া হয়নি। উপজাতি নেতৃবৃন্দের দাবি অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি। রাস্তা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় খাগড়াছড়ি থেকে মাটিরাঙ্গা; মানিকছড়ি হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাতে চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী এবং অন্যদের খাগড়াছড়িতে যাতায়াত সুবিধা হয়।[১৩]

এরশাদ সরকারের আমলে পাহাড়ীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ করার পরও যখন পার্বত্য বিদ্রোহীরা লড়াই থেকে বিরত হচ্ছিল না, তখন প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট নিরসনে রাজনৈতিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এরশাদ সরকার ১৯৮২ সালের ১৩ ই জুন শান্তি বাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন ও এবং পরে তা ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সাধারণ ক্ষমতার আওতায় পার্বত্য বিদ্রোহীদের একটি অংশ প্রীতি গ্রুপের প্রায় ২৫০০ সদস্য অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করে। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে সশস্ত্র পন্থা ত্যাগ করে।[১৪]

এরপর ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর তদানীন্তন পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ, কে, খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহিত সমিতি'কে আলোচনায় আনা সম্ভব হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৬টি আলোচনা হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭ জনসংহতি সমিতি যে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে তার অন্যতম ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের চুড়ান্ত প্রকাশ, যা মানলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠে এক চমৎকার জুমল্যান্ড, যা বাঙালির জন্যে নিষিদ্ধ দেশ, বাংলাদেশের ভিতর থেকেও বিদেশ।[১৫] পারস্পরিক আলোচনায় জনসংহতি সমিতি তাদের উত্থাপিত দাবি আদায়ে যেমন অনড় ছিল তেমনি বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না।

পরবর্তীতে এরশাদ ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাশ করে (পার্লামেন্ট এক্ট নং ২৮.২.৮৯)। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যই উপজাতি হবেন। পরিষদের ৩০ সদস্যের ২০ জন উপজাতি ও ১০ জন বাঙালির সমন্বয়ে গঠন করা হয় এ পরিষদ। কিন্তু জনসংহতি সমিতি সরাসরিভাবে পরিষদকে প্রত্যাখ্যান করলেও ১৯৮৯ সালে ২৫ শে জুন বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিষদকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে গণ আন্দোলনের কারণে বিব্রত এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আর কোন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

খালেদা জিয়ার শাসনকাল (১৯৯১-১৯৯৫):

খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ের প্রথম থেকেই পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদকে প্রধান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয় যার প্রথম বৈঠক বসে ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১। উক্ত কমিটি ১৯৯৪ সালের মে মাসে শান্তিবাহিনীর সাথে সাতটি বৈঠকে বসে এবং তৈরী হয় একটি উপ-কমিটি যার প্রধান ছিলেন সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। এই কমিটি দুদুক ছড়ায় সাত বার জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠকে বসে। শেষ বৈঠকটি হয় ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫।[১৬] খালেদা জিয়ার আমলে জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের স্থানে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি সহ সংশোধিত দাবি নামা উত্থাপন করে।

শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬-২০০০) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭:

পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান মর্মে অঙ্গীকার করে। শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে। ধারাবাহিক কয়েকটি বৈঠকের পর ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি স্থায়ী শান্তিচুক্তিতে উপনীত হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। পরিশেষে ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সরকার বিভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়াস পেয়েছে তা নিম্নে বিশদভাবে উপস্থাপিত করা হলো ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ :

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়। মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শাসনকার্যে ক্ষমতা বন্টনের অন্যতম বাহক হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির অনেকাংশই নির্ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের উপর। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার কথা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতি যিনি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংসদে উত্থাপিত হয় ১২ ইং এপ্রিল ১৯৯৮ সালে এবং ১৯৯৮ সালের ৭ই মে তা সংসদে আইন আকারে পাশ হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের ২৫ শে মে থেকে পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর হয়। সরকার ২২ জন সদস্যের একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে দেয় যা ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে এবং পরিষদ স্থাপিত হয় রাঙ্গামাটিতে মে ২৭, ১৯৯৯।[১৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন :

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের গঠন নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদ মর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।

৩। চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

চেয়ারম্যান একজন,

সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন,

সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন,

সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) ৬ জন,

সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ১ জন।

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মারমা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হইবে। পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।[১৮] নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের গঠন চিত্রিত করা হয়েছে।

ছক-২ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

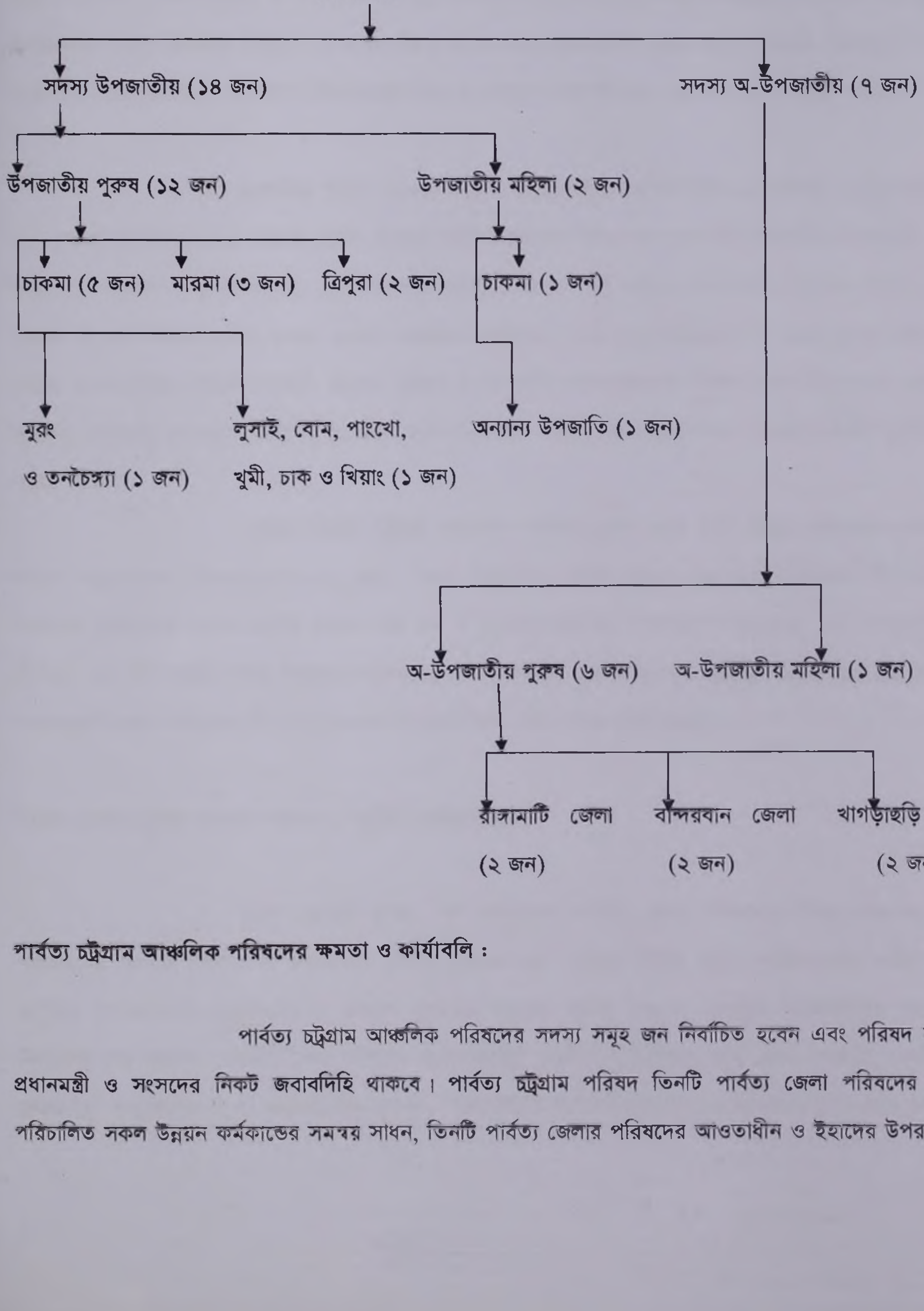

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সমূহ জন নির্বাচিত হবেন এবং পরিষদ সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের নিকট জবাবদিহি থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, তিনটি পার্বত্য জেলার পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়াদির সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। চুক্তি অনুযায়ী যে সকল দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণিত করা হলো।

পরিষদ পৌরসভা সহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এন,জি,ও দের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করতে পারবে। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।[১৯]

আঞ্চলিক পরিষদ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করতে সরকারকে সহায়তা করবে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন করতে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতি জনগণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এই ধরণের আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইনের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কোন কোন উৎস থেকে পরিষদের তহবিল গঠন করতে পারবে তাও লিপিবদ্ধ করা হয়। যথা : জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ; পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ বা অনুদান; কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা; পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ :

চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির "খ" অনুচ্ছেদে পার্বত্য জেলা পরিষদের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার ও জনসংহতি সমিতি চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টতঃভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত উপজাতিদের অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজাতিদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদে অ-উপজাতীয় বাঙালিদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য চুক্তির "খ" অনুচ্ছেদের ৪(খ) অনুযায়ী বলা হয়েছে- "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেড ম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চিফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেলের চিফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতিত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।[২০] এভাবে অ-উপজাতীয় বাঙালিদের প্রার্থীতা নিশ্চিত করতে সার্কেল চীফের সার্টিফিকেট এর বাধ্যবাধকতা প্রণয়নের মাধ্যমে মূলত পার্বত্য জেলায় অস্থায়ী বাঙালিদের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, পার্বত্য জেলা পরিষদের বিবিধ পদে নিয়োগ, বদলী ও পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে উপজাতিদের সমবায় অংশগ্রহণের দাবিকে আরও সুস্পষ্ট করে। এছাড়াও চুক্তির "খ" অনুচ্ছেদে ১৪(খ) বলা হয়েছে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। অনূরূপ ভাবে চুক্তির "খ" অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে চুক্তির "খ" অনুচ্ছেদের ৬ নং ধারা অনুযায়ী সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগে উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চুক্তির একই অনুচ্ছেদের ১০ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্য উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদানের উল্লেখ আছে। এছাড়াও প্রশাসনিকভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে স্থানীয় বিবিধ কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের জন্য আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রশাসনিক কার্যাবলিতে উপজাতিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সংক্ষিপ্তায়ন করলে দেখা যায়, পার্বত্য উপজাতিদের উপর শোষণ-বঞ্চণার ইতিহাস সুদীর্ঘ। পাকিস্তান আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মতো উন্নয়ন কার্যের সুফলসমূহ থেকে পার্বত্যবাসীদের বঞ্চিত করে দেশের অপরাপর স্থানে তা স্থানান্তর করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও পাহাড়ীদের সংস্কৃতি, ভাষা ও স্বকীয় আত্মপরিচয় সংরক্ষণের অবহেলায় পার্বত্য উপাজতিরা নিজেদের আরও বেশী নিরাপত্তাহীন ভাবতে থাকে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পাহাড়ীদের দাবি সমূহ স্বাধীনতাত্তোর সরকার গুলোর কাছে মূল্যায়িত না হওয়ায় তারা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে দাবি আদায়ে লক্ষ্য স্থির করে। এরূপ অবস্থায় পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শক্তি প্রয়োগ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। উপরোন্ত, সমতল এলাকাসমূহ থেকে বাঙালিদের পাহাড়ে স্থানান্তরের ফলে পাহাড়ীরা তাদের বহুদিনের ভোগকৃত ভূমি ও সম্পদের উপর তাদের অধিকার হারাতে থাকে। শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম ও সরকার কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগে পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তক্ষয় ও জানমালের ক্ষতি ছাড়া কোন পক্ষই যখন লাভবান হচ্ছিল না তখন সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা শুরু করে। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় অঞ্চলভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি সরকারের পক্ষে মেনে নেয়া যেহেতু সম্ভব ছিল না তাই পাহাড়ীর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ক্ষমতায়নে পার্বত্য সমস্যাসমূহ সমাধানে আগ্রহী হয়। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিবিধ অনুচ্ছেদ, ধারা, উপধারা গুলোতে জনসংহতি সমিতির নেতারা আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় প্রশাসনে উপজাতিদের প্রাধান্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আশাবাদী হয়েছিলেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার মাধ্যেমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*। পৃ -২৩, ঢাকা : সন্দেশ।

২. Nasreen, Z., & Togawa, M. (1985). Politics of Development : 'Pahari-Bengali' Discourse in the Chittagong Hilltracts. 103-103.

৩. *Ibid, 103-103*

৪. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ -৩৮, op.cit.

৫. চাকমা, সিদ্ধার্থ (১৯৮৬)। *প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম*। পৃ -৯, কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স।

৬. রশিদ, হারুন-অর (১৯৮৯, জুলাই ১৭-২০)। জাতীয় সংহতির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ। *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

৭. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। *জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়*। পৃ- ১১৬, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী।

৮. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ -৩৯, op.cit.

৯. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। পৃ- ৩৭, op.cit.

১০. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ -৫৪, op.cit.

১১. Chowdhury, N. J. (2009). The Chittagong Hill Tracts Accord Implementation in Bangladesh : Ideals & Realities. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, *Volume : XXV*No 2.

১২. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১৩. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। পৃ- ৪৫, op.cit.

১৪. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ -৫৭, op.cit.

১৫. আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৭)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়েরর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা*। পৃ -৩৫, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

১৬. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ -৬০, op.cit.

১৭. Chowdhury, N. J. (2009). The Chittagong Hill Tracts Accord Implementation in Bangladesh : Ideals & Realities. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, *Volume : XXV*No 2.

১৮. The Chittagong Hill Tracts Accord of 1997. (n.d.). Retrieved December 29, 2014, from www.mochta.gov.bd

১৯. *ibid*

২০. *ibid*

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিস্থাপন করে। কেননা, প্রান্তিক গোষ্ঠীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃত্বের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। এই ক্ষেত্রে বড় সমাজে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ভাবে সীমিত না করে তা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভাজনের মধ্য দিয়ে শাসনকার্য পরিচালিত হলে একটি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। কেননা এই প্রক্রিয়ায় সরকাররের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

একটি দেশের জন্য স্বাধীনতা যেমন অপরিহার্য ঠিক তদ্রুপভাবে একই দেশের মধ্যে কোনো কোনো এলাকার বা জনগোষ্ঠীর জন্য স্বায়ত্বশাসন এবং স্থানীয় সরকারও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান বিশ্বে বিশেষভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠী বা বিশেষ জায়গায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করলে সেটার ফল ভালো হয় না। স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরবর্তীতে স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হওয়ার আশংকা থাকে। ১৯৬৬ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে বাঙালিরা ৬ দফার মাধ্যমে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। পাকিস্তানিরা তা প্রত্যাখ্যান করলে ৬ দফা তখন এক দফায় পরিণত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে ইতিহাসের এ বিষয়টি সরকার, রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ এবং সচেতন জনগণকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। পাহাড়ীদের দাবি সমূহকে মূল্যায়িত না করায় তারা সশস্ত্র হয়ে উঠে। পাহাড়ীদের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রশমিত করতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। অবশেষে, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের এবং পাহাড়ীদের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতা চুক্তি। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও পাহাড়ীদের মাঝে আস্থার অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামকে পুনরায় সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। চুক্তি বাস্তবায়নে এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয় যাতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা দেশে আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। চুক্তির বাস্তবায়ন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। নিম্নের আলোচনায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব তার একটি তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনা করা হল।

শান্তির সংজ্ঞা ঃ

শান্তির সংজ্ঞা একটি মাত্র সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। মূলত এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে সহিংসতা নেই। সংঘর্ষের অনুপস্থিতিকেও আমরা শান্তি বলে অভিহিত করতে পারি। শান্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা উপস্থাপন করেছেন। রিট বার্গার এর মতে, Peace is more than no war. মিসেল ব্যাংক এর মতে, Peace is an intellectual matter. সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine) এর মতে, Peace as "the condition of a community in which order and justice prevail, internally among its members and externally in its relations with other communities. আলবার্ট আইনস্টেন (Albert Einstein) এর মতে, Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding. অতএব, সহিংসতা ছাড়া, যুদ্ধ ছাড়া যে অবস্থা বিরাজ করে তাকে শান্তি বলতে পারি। আরেকটু বিশদভাবে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি, যে অবস্থায় মানুষ তার স্বাভাবিক ও মৌলিক অধিকার গুলো উপভোগের সুযোগ পায় সেই অনুকূল অবস্থাকে শান্তি বলা যায়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ উপায় সমূহ ঃ

১. আলোচনা ও সংলাপ (Negotiation and Dialogue) ঃ

শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংঘর্ষ এড়াতে একটি সহায়ক উপায় হচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্য মধ্যস্থতা ও সংলাপ। মূলত বিবাবদমান দুটি পক্ষ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসমূহ আদায়ের বিষয়ে আলোচনা ও সংলাপ হলো- একটি শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষ তাদের দাবি সমূহের যৌক্তিকতা তুলে ধরে নিজেদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তির মাধ্যমে সংঘর্ষ এড়াতে সচেষ্ট হয়। তদ্রুপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তির পূর্বে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেও কয়েকবার বৈঠক ও আলোচনা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরিবেশ তৈরীতেও সরকার আলোচনা ও সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ আলোচনা ও সংলাপ পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সমূহের সংকট নিরসনেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কেননা আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে উভয় পক্ষই সমস্যা সমাধানে পরস্পরকে ছাড় দিয়ে একটি অভিন্ন স্বার্থে চুক্তিতে উপনীত হতে পারে। পার্বত্য সংকট নিরসনে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মাঝে আলোচনা ও সংলাপের ফলশ্রুতিই হচ্ছে শান্তিচুক্তি।

২. আস্থা তৈরি (Confidence Building) ঃ

জাতিগত সংঘর্ষ নিরসনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে তাদের সহযোগিতা করতে হবে। জাতিগত সংকট নিরসনের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করতে গিয়ে David A. Lake and Donald Rothchild এর Containing Fear : The Origins and Management of Ethnic Conflict- এ জাতিগত সংকট কিভাবে নির্বাহী পরিচালনের মাধ্যমে নিরসন করতে হয় তার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জাতিগত সংকটে স্থানীয় এলিট ও সরকার এবং বহির্গত রাষ্ট্র ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যকরী পরিচালন মূলত সংখ্যালঘুদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা প্রদান করে। আত্মবিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে মূলত কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটি উপজাতি গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়।[১] একটি রাষ্ট্রে কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যদি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নিজেদের দুর্বল মনে করে ঠিক তখন আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে জাতিগত দাঙ্গা ও সংঘর্ষ নিরসনে এটি একটি উপযুক্ত পন্থা।

৩. সম্মান প্রদর্শন (Demonstration of Respect) ঃ

উপজাতি গোষ্ঠীর নিরাপত্তার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে উপজাতিদের প্রতি পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি বিশেষ অধিকার দান করতে হবে। প্রথমত, প্রত্যেক উপজাতি গোষ্ঠীকে একটি সত্ত্বা হিসেবে সম্মান এবং তাদের বৈধ স্বার্থ গুলোকেও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে উদাহারণ স্বরূপ বসনিয়া অনেক বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যখন সার্বিয়া শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মেরুকরণ গড়ে তোলে। মূলত এই প্রবণতার মাত্রা অধিক বেড়ে গিয়েছিল যখন সার্বিয়ারা তাদের আধিপত্য দেখায় যে, তারাই সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় একমাত্র মানুষ যাদের অধিক মেধা, শক্তি, অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহ্য রয়েছে। সার্বিয়ারা বসনিয়দের তাদের অধীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং এভাবে বসনিয়দের যুগোশ্লাভিয়ায় সংখ্যালঘু বিবেচিত করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের প্রতি অবিশ্বাস তাদের দাবি-দাওয়া গুলোকে অনেক বড় করে তোলে। আর তাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে যারা এলিট তাদের অবশ্যই সংখ্যালঘুদের নিজস্ব পরিচয়, দাবি-দাওয়া গুলোকে গুরত্ব দিতে হবে নয়ত তাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে এবং দূরত্ব বাড়বে। আর তাই জাতিগত সংকট নিরসনে উপজাতি গোষ্ঠীর স্বকীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে উপজাতিদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।[২]

৪. ক্ষমতা ভাগ (Sharing of Power) ঃ

এই ধরণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মূলত একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেমন ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবশ্যই উপজাতি গোষ্ঠী গুলো এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুলোর নিজস্বতা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের মাঝে ক্ষমতা ভাগ তাদের নিজস্ব পরিচয় বা জাতীয়তা নিয়ে যে সংকটটি সেটি দূরীভূত করে। মূল ব্যাপারটি হলো ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না রেখে উপজাতি গোষ্ঠী গুলোর কাছে ক্ষমতা প্রদান। উদাহারণ স্বরূপ, কসোভোতে ক্ষমতা বিভাজন চুক্তি বলকানে ভবিষ্যতে কোনও দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রাখবে। এই প্রক্রিয়ার কোনও একটি সমাজে সংঘর্ষ পরবর্তী অবস্থায় কিছু বিধান তৈরি করা হয়। যেমন, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে ভাষা নীতি এবং শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়। আর যখন একটি সরকার গণতান্ত্রিক হয় তখন উপজাতি গোষ্ঠী গুলো প্রক্রিয়াটি মেনে নেয় এবং পরবর্তীতে কোন সংঘর্ষও তৈরি করে না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে ডেটন চুক্তি (Dayton Accord)[৩] এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে যেখানে একটি যৌথ প্রেসিডেন্সি এবং সংসদের মাধ্যমে তিনটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী একসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এক্ষেত্রে বসনিয়াও তাদের বেসামরিক যুদ্ধের পর এই ব্যবস্থা প্রচলণ করে। ক্ষমতা ভাগ এমন একটি পন্থা যেটি বেসামরিক যুদ্ধের নিরসন করে এবং কোন চুক্তিকে বৈধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে সাহায্য করে।

৫. নির্বাচন ঃ

নির্বাচন যদিও একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়, কিন্তু উপজাতি সংকট নিরসনে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্যে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অন্যান্য দলের সাথে একটি সংযোগ স্থাপন হয় যেটি তাদের ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি দুইভাবে হতে পারে। যথা-

১। 'নির্বাচন পদ্ধতি' হতে হবে এমন যেখানে একের অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করবে। উদাহারণ স্বরূপ, ১৯৭৯ এবং ১৯৯৫ সালে নাইজেরিয়াতে হয়েছিল।

২।'নির্বাচন পদ্ধতি' এমন হতে হবে যেখানে সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি থাকবে। যেটি সংখ্যালঘুদের উৎসাহিত করবে ক্ষমতায়নে এবং শাসনকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। উদাহারণ স্বরূপ রাশিয়ান রাষ্ট্র ডুমাতে ১৯৯৩ সালে ৪৫০জন সদস্যের একটি সংসদের নিম্নকক্ষ গঠন করা হয়, যেখানে অর্ধেক হলো সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সদস্য (Single-member constitutencies) এবং বাকি অর্ধেক হলো সমানুপাতিক প্রতিনিধি (Proportional representation)। এই পদ্ধতিটি ছোট ছোট ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৬. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

ক্ষুদ্র উপজাতি গোষ্ঠী গুলোর সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি স্থাপনের আরেকটি বহুল ব্যবহৃত উপায় হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সাধারণ অর্থে জনগণের কল্যাণে কাজ করে এমন প্রশাসন ও তাদের দায়িত্ব সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকার হতে সরকার অধীনস্থ, স্বায়ত্তশাসিত অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তর প্রক্রিয়াই হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। প্রথমত, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত বলে বিবেচিত করা হয। এটি প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের সাথে সম্পর্কিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশের সাধারণ জনগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে সব সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না হয়ে বিপুল সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণে তৈরি সেসব সিদ্ধান্ত অধিক কার্যকরী হয়। এই প্রক্রিয়াটি জনগণকে যেমন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে তেমনি ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও জনগণের সকল প্রয়োজন অনুধাবন করতে পারে। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না রেখে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণ উভয়ের হাতেই ন্যস্ত হয়, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় ।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবার বিবিধ উপায়ে হতে পারে যেমন ঃ

ক) ভৌগলিক স্বায়ত্বশাসন / স্বায়ত্বশাসন
খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
ঘ) স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন ।

ক. ভৌগলিক স্বায়ত্তশাসন ঃ

কোন একটি ভৌগলিক অঞ্চলে কোন উপজাতি গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গুলো অনিরাপত্তা বোধ করে তখন তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে ভৌগলিক স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গুলোর ক্ষমতায়ন করা হয় । এরূপ জাতিগত সংকট নিরসনে এটি একটি অন্যতম পন্থা । স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Ted Robert Gurr (1993, 292) বলেন, স্বায়ত্তশাসন হলো মূলত অঞ্চলভিত্তিক বা সমষ্টিগত সমাজে সংখ্যালঘুদের সমষ্টিগত ক্ষমতায়ন । Barbara Harff and Ted Robert Gurr (2004, 221) বলেন, স্বায়ত্তশাসন হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে কোন গোষ্ঠীর তাদের ভৌগলিক সম্পদ ও জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে তবে তাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেয়া হবে না । স্বায়ত্তশাসন মুলত কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয় এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন একটি চরম পর্যায়ের সংকট ও সংঘর্ষ নিরসনের ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসিত সরকারের কাছে ক্ষমতাকে বন্টন করে ।

এই ধরণের শাসন কোন একটি রাষ্ট্রে প্রত্যেক গোষ্ঠীকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের অধিকারকে রক্ষা করে ও তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে । এছাড়া এরকম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কোন একটি গোষ্ঠীর ধর্মীয়, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত অধিকার রক্ষা করে । পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমূহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিরা তাদের জাতিগত স্বকীয় পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মগত অধিকার রক্ষায় স্বায়ত্বশাসনের দাবি করে আসছিল । কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই দাবি মেনে না নেওয়ায় পরবর্তীতে পাহাড়ীরা স্বায়ত্বশাসনের বদলে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নের জন্য চুক্তি করে । অর্থাৎ পার্বত্য উপজাতিরা স্বায়ত্বশাসনের বদলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়িত হতে চেয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি অঞ্চলকে সমানভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় এবং প্রত্যেক অঞ্চলের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাল সম্পর্ক থাকে। এই তত্ত্বটিতে মূলত কোন একটি অঞ্চল সেটি ভৌগলিক হোক আর না হোক সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। কোন একটি উপজাতি গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাতিগত সমস্যা, সংকট ও সংঘর্ষ নিরসনে আগে যদিও এটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত না, তবে বর্তমানে এটি কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। কেননা এই ধরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় এবং অঞ্চল ভিত্তিক কর্তৃত্ব স্থানীয় নেতাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। বিশ্বে জাতিগত সংকট নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই প্রক্রিয়াতেই মূলত বসনিয়া, শ্রীলঙ্কা, সাইপ্রাস, সুদান, এঙ্গোলো, ও মোজাম্বিকে শান্তি চুক্তি হয়েছিল।

ঘ. স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নঃ

কোন একটি রাষ্ট্রের গঠন এবং ভূমিকাও অনেক সময় স্থানীয় পর্যায়ে সংকট তৈরি করে। রাষ্ট্রই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এমনকি নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কারা পাবে তার নিয়ন্ত্রকও কিন্তু রাষ্ট্র। বর্তমানে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের জন্যই বিভিন্ন দেশে তুমুল প্রতিযোগিতা চলছে। আর তাই সংঘর্ষ বন্ধ করা যায় রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে। যখন কোন একটি রাষ্ট্রের সংবিধান এমন ভাবে গড়ে উঠে যেখানে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মকে বেছে নেয় তখন রাষ্ট্রের অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় অন্যান্য সম্প্রদায় গুলো তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। পরবর্তীতে যা তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে উৎসাহিত করে। আর এরূপ সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি স্থাপনে স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঐ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করে।

এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন গোষ্ঠীকে স্থানীয় ক্ষমতা দেয়া হয় কারণ স্থানীয় সরকারটি হয় অনেকাংশে ছোট এবং জনসংখ্যাটি হয় সমজাতীয়। উদাহারণ স্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইথিওপিয়াতে জাতিগত সংকট নিরসনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বেশি সফল। এই তত্ত্বটি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সংকট নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পরে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি কার্যকর মডেলঃ

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতিগত সংঘর্ষ নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নির্ভর করে সংঘর্ষের ধরণ, ভৌগলিক রাজনীতি, স্থানীয় জনগণের দাবি-দাওয়া, সংখ্যালঘুদের প্রকরণ (ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা,

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ) বা স্থানীয় জনগণ কোন বিবেচনায় নিজেদের সংখ্যালুঘু মনে করে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। তাছাড়া সংঘর্ষ নিরসনে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সরকার পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিটি কতটুকু ফলপ্রসু হবে। অর্থাৎ সংঘর্ষ নিরসনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিবিধ উপায় সমূহ থেকে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি প্রয়োগের উপরই নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটি কতটুকু ফলপ্রসু হবে। জাতিগত সমস্যা সমাধানে কোন একটি উপায় কার্যকর করার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে পরবর্তীতে তা মূল্যায়নের দাবি রাখে। কোন অঞ্চলে উপজাতি গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গুলোর সমস্যাটির উপর গুরুত্ব না দিলে সময়ের ব্যবধানে সমস্যাটি আরও জটিল হতে পারে। ফলে সমস্যার শুরুতে সমাধানের উদ্যোগ এক রকম হলেও পরবর্তীতে সমাধানের পদ্ধতির পরিবর্তন আসতে পারে। যেমনটি আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে দেখতে পাই। প্রথম দিকে পার্বত্য সমস্যাটিকে সামরিক বিবেচনায় সমাধানের উদ্যোগ কার্যত ব্যর্থ হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাঙালিদের পাহাড়ে বসতি স্থাপন বর্তমানে এ সমস্যাকে আরও বেশি সাংঘর্ষিক ও জটিল করেছে। আবার দেশ, কাল, সমস্যা ভেদে জাতিগত সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি স্থাপনে এক ধরণের তত্ত্ব বা অনেক পদ্ধতি একসাথে প্রয়োগ ও কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন সাম্প্রতিক কালে রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডি সংঘর্ষে 'ক্ষমতা ভাগের মাধ্যমে গণতন্ত্র' (Power sharing democracy)[৪] পদ্ধতিটি প্রয়োগে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। আবার একই পদ্ধতি লেবাননের বেসামরিক যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তি স্থাপনে পদ্ধতিটি সফল হয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ জাতিগত সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি স্থাপনে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা স্বাধীন বাংলাদেশে যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের দাবি সমূহ মেনে নিতে সরকারকে চাপ প্রয়োগে ব্যর্থ হয়, তখন উপজাতিরা তাদের দাবি আদায়ে সশস্ত্র পথ বেছে নেয়। অপরদিকে সরকারও উপজাতি বিদ্রোহ দমনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ পার্বত্য পরিস্থিতিকে আরও অশান্ত করে তোলে। পাহাড়ীদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি বাংলাদেশের মতো এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় মেনে নেওয়ার সুযোগ না থাকায় উভয় পক্ষই স্থানীয় ক্ষমতার মাধ্যমে সংকট নিরসনে আগ্রহী হয়। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সশস্ত্র সংগ্রাম, সমস্যা ও সংকট নিরসন করতে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন ছিল। চুক্তির খ ও গ অনুচ্ছেদে ব্যাপকভাবে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। মূলত পার্বত্য জেলা পরিষদ ও তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ফলে প্রকারন্তরে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় উপজাতিদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর বিবিধ ধারা,

Dhaka University Institutional Repository

উপধারা ও শব্দের বিলুপ্তি ও প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে মূলত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় উপজাতিদের অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ গুলোর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় এবং অঞ্চল ভিত্তিক কর্তৃত্ব প্রদান সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার প্রয়াস স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসাবে কতটুকু ফলপ্রসূ? অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন হলে হলে সেখানে শান্তি ফিরে আসবে কিনা?

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি সংকট নিরসনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিভাজিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল সমূহ অনুশীলনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা তা নিরূপনের মানদন্ড হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন স্থানীয় পাহাড়ীদের অধিকার সমূহ অনুশীলনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা তার উপর।

(১) অংশ গ্রহণ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে পাহাড়ীদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। এই অংশগ্রহণ বিবিধ উপায়ে হতে পারে যেমন- জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ সম্পাদিত হওয়ার পরও সেখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারা। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় প্রশাসন গঠিত হয়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ ও আঞ্চলিক পরিষদের পদসমূহ নির্বাচন নয় বরং সরকার মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল তথা পার্বত্য জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হতে পারে।

(২) অধিকার ভোগ ঃ

বিকেন্দ্রীকরণ জানমালের নিরাপত্তা, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, মানবাধিকারের অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। যে কোন ধরণের বৈষম্য দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। তদ্রুপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন পাহাড়ীদের ভূমির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, মানবিক অধিকার সমূহ নিশ্চিতকরণের উপর নির্ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত না হাওয়ায় উপজাতিরা তাদের স্বাভাবিক অধিকার সমূহ উপভোগ করতে পারছে না। আজও অবাধে বাঙালি, প্রভাবশালী সামরিক, বেসামরিক এলিটদের দ্বারা ভূমি দখল ও ভূমি অধিগ্রহণ অব্যাহত থাকায়, আজও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অস্থায়ী সেনা ছাউনী গুলো প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এখনও সেনাবাহিনী প্রয়োগ করা হয়। স্থানীয় উপজাতি নেতৃবৃন্দের উপর সেনাবাহিনীর নজরদারি, আটক তাদের মৌলিক অধিকার গুলো অনুশীলনে বাঁধাগ্রস্থ করছে। উপজাতি শরণার্থীরা দেশে ফিরে এসেও তারা তাদের ভূমিতে ফিরতে পারছে না। দেশান্তরিত উপজাতি শরণার্থীরা আজ দেশের অভ্যন্তরে শরণার্থী। তাদের জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার গুলো আজও অনিশ্চিত। পাহাড়ীদের মধ্যকার ক্ষোভ ও অসন্তোষ পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় সংকট তৈরী করতে পারে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি নিশ্চিত করতে হলে পাহাড়ীদের অধিকার সমূহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সহিংসতার অনুপস্থিতি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরেও সেখানে সহিংসতা বিরাজ করছে। মূলত পার্বত্যবাসীর মাঝে আস্থার সংকটই এই সহিংসতার কারণ। চুক্তি সম্পাদনের ফলে আশা করা হয়েছিল যে আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। অথচ স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি রোধ করতে পারছে না। স্থানীয় পার্বত্য রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও কোন্দলে অস্ত্র প্রয়োগের সহিংসতা বন্ধ করতে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষতায়ন না থাকায় এটি ব্যর্থ। এছাড়া ভূমি সমস্যার সমাধান ও শরণার্থী পুর্নবাসনের বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলো পার্বত্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই সকল কারণে বাঙালি ও পাহাড়ীদের মাঝে যে আস্থা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে, তার ফলে প্রায়শই পাহাড়ী বাঙালিদের মাঝে সহিংসতা দেখা দেয়।

(৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও আঞ্চলিক পরিষদ তা প্রয়োগ করতে পারছে না। স্থানীয় ভূমি অধিগ্রহণ, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, নতুন কোন আইন প্রণয়ন কালে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে তা করার বিধান থাকলেও সরকার বিভিন্ন সময় তার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই গ্রহণ করেছে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন, বন্য প্রাণী ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি। ভূমি অধিগ্রহণ কালে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেনি। ক্ষমতায়ন ছাড়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অকার্যকর। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদকে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

(৫) স্থানীয় ক্ষমতায়ন ঃ

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষমতার ভাগ পাচ্ছে কিনা। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার কথা থাকলেও আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করেছে তা প্রয়োগের কর্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি কাঠামো মাত্র যার বাস্তবিক ক্ষমতায়ন হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ তার বিবিধ কার্যাবলী সম্পাদন ও কর্তৃত্ব স্থাপনে ক্ষমতায়িত না হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন, রাজস্ব আদায়, লাইসন্স প্রদান, বাজেট প্রণয়ন এই সকল অধিকার সমূহ অনুশীলন করতে পারে নাই। আঞ্চলিক পরিষদের দুর্বলতার কারণে জনগণও আঞ্চলিক পরিষদ থেকে কোন সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের পূর্বশর্তই হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যহত হবে।

পরিশেষ ঃ

জাতিগত সংকট নিরসন করতে প্রথমেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের দাবি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানান্তরের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতার ভাগ তাদের বিদ্রোহের চেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমূহ সমাধানে উদ্যোগী করে তোলে। ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করলে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। শান্তিচুক্তি এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সূচনা মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতায়ন একটি মূখ্য বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে ক্ষমতাকে ভাগ করে দিতে হবে এবং তা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে হতে পারে। শান্তি চুক্তিতে যদিও আঞ্চলিক পরিষদের হাতে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সহ নানাবিধ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করার কথা বলা হয়েছে। তথাপি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সরকার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে না হয় সরকার অন্য কোন প্রশাসনিক অবকাঠামোকে ব্যবহার করে আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ফলে সকল ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত না

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতীশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। আপাতদৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বিরাজ করলেও স্থায়ী শান্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সংকট দূর করতে সেখানে স্থানীয় জনগণকে ক্ষমতা দেয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট নিরসনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই একমাত্র উপায়। ইতিমধ্যেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার একটি তাত্ত্বিক দিক আমরা উপরে আলোচনা করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল সমূহ স্থানীয়দের মধ্যে উপভোগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি কাঠামো মাত্র যার বাস্তবিক ক্ষমতায়ন ব্যাতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

1. A. Lake, D., & Rothchild, D. (1996). 'Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict'. In *International Security* (Vol. 21, No. 2, Pp. 41-75). The MIT Press.
2. Hosena, Saiyada Anoyara,(1999), *War and Peace* in the *Chittagong Hill Tracts*: *Retrospect* and *Prospect*, p 23, Dhaka : Agamee Prokashani.
3. Clinton, B. (2013, June 26). Dayton Accords. Retrieved from http://global.britannica.com/EBchecked/topic/153203/Dayton-Accords
4. Colin Waugh, *Paul Kagame and Rwanda: Power, genocide and the Rwanda Patriotic Front* (2005), p. 61.

Dhaka University Institutional Repository

৪ অধ্যায়

ভূমি অধিকার ও শান্তিচুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবাদমান নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল ও বহুদিন যাবত একটি অমিমাংসিত সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তাবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং-ই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান করা। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে অমিমাংসিত বহুবিধ সমস্যা, ক্ষোভ, বঞ্চণার পেছনে রয়েছে এ অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা, ক্ষোভ ও বঞ্চণার ইতিহাস সুদীর্ঘ। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে লোন নিয়ে জমি অধিগ্রহণ করেন। ঋণকৃত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হয় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানী করতে। বাদ বাকী অর্থ পেপার মিলটি প্রতিষ্ঠা ও নিয়োজিত চাকুরীদের বাসস্থান নির্মাণে ব্যয় করা হয়। চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে প্রায় দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১০-২০ জন পাহাড়ী মিলের নিম্নস্তরের চাকুরীতে নিয়োগ পায়। পাহাড়ীরা পাহাড় ও বন থেকে পেপার মিলের কাঁচামাল বাঁশ সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত হয়। সরকারের মিল স্থাপনে পাহাড়ের জমি ও কাঁচামাল বাঁশ ব্যবহার করে বৈদিশিক অর্থ আয় করলেও পাহাড়ীরা বঞ্চিত হলো তাদের আবাদী ভূমি ও বাসস্থান থেকে। চন্দ্রঘোনা পেপার মিল যে স্থানে স্থাপিত হয় সেখানে ছিল মারমা অধিবাসীদের বাস। মারমারা তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হলো এবং পেপার মিল চালু হবার পর ধীরে ধীরে এখানে বাঙালি চাকুরীজীবীরা বসতি গড়ে তোলে।[১]

১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার (১৯৪৭-১৯৭১) রাঙামাটিতে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। এই বাঁধ স্থাপনের ফলে কর্ণফুলীর তীরবর্তী কাপ্তাই (Kaptai), চেংগী (Chengi), কাসালং (Kassalong) এবং মায়নী (Maini) এলাকার প্রায় ৫৫০ বর্গমাইল এলাকার উর্বরা চাষযোগ্য ধানী জমি পানিতে নিমজ্জিত হয়। কাপ্তাই বাঁধের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রায় ১০০,০০০ চাকমা অধিবাসী যা কিনা ঐ সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মোট অধিবাসীর ২৫ শতাংশ, ক্ষতিগ্রস্থ আবাদী জমির প্রায় ৪০ শতাংশ উর্বরা কৃষি জমি। কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছিল তা ছিল খুবই অপ্রতুল এবং তাদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। একটি বৃহৎ চাকমা জনগোষ্ঠী বাসস্থান ও চাষযোগ্য ভূমি হারিয়ে ভারতে শরণার্থী হিসাবে চলে যায়।[২]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত কাপ্তাই বাঁধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ীরা শুধু ক্ষতিগ্রস্থই হয় নাই বরং তাদের মাঝে দেখা দেয় ক্ষোভ ও হতাশার। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশকে আলোকিত করার সাথে সাথে পাহাড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্বেষের কালো অন্ধকার। বাংলাদেশ আলোকিত হলো আর পাহাড়ীদের ঘরবাড়ী অতল জলে তলিয়ে গেল। বাঙালিদের খুশি করার নাম করে পাকিস্তানিরা সুকৌশলে উপহার দিল এই অঞ্চলের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর গোপন ক্ষোভ। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান তাঁদের (পাহাড়ীদের) পানিতে ভাসিয়ে দেয়, জলে ডুবিয়ে দেয়। পাকিস্তানের জন্য যা ছিল বিদ্যুৎ, তাঁদের জন্য তা ছিল বিপর্যয়।[৩]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি সমস্যা ও ভূমিকে ঘিরে পার্বত্য অঞ্চলে যে ক্ষোভ তা একদিনে হয়নি। স্বাধীনতার অব্যহতি পূর্বে পার্বত্য চট্রগ্রামের বেতবুনিয়ায় একটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত করার কাজ শুরু হয় এবং যার কাজ শেষ হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। এই ভূ-উপগ্রহটি স্থাপনের সময়ও সেখানে বসবাসরত মারমা সম্প্রায়দায়কে উচ্ছেদ করা হয়।[৪]

আশির দশকে পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক বাঙালি লোকের বসবাসকে ঘিরে এই ভূমি সমস্যা আরও প্রকট ও জটিলরুপ ধারণ করতে থাকে। তাছাড়া সরকারের জমি অধিগ্রহণ, সেনাবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন, জমির ইজারা বাণিজ্য প্রভৃতি স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীদের ভূমির উপর তাদের অধিকারকে খর্ব করেছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ, কর্ণফুলি পেপার মিল স্থাপন, পার্বত্য চট্রগ্রামে বাঙালিদের বসতি স্থাপন প্রভৃতি কারণে পার্বত্য চট্রগ্রামের সহস্রাধিক উপজাতি পরিবার হয়েছে বাস্তুহারা ভুমিহীন। পার্বত্য চট্রগ্রামে ভূমি সমস্যাটি আরও অনেক সমস্যার প্রসূতি। পার্বত্য চট্রগ্রামে উপজাতি সম্প্রদায়ের ভূমির উপর অধিকার, ভূমি সমস্যার কারণ ও ভূমি সমস্যার স্বরুপ জানার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা জরুরী। নিম্নে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১৫৫০ সালে পর্তুগীজ মানচিত্রকর Job De Barros এর আকাঁ মানচিত্রে CHACOMA বা চাকমা রাজ্যের অবস্থান বা সীমানা দেখানো হয়েছে তাতে উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ্রে বা নাফ নদী, পূর্বে লুসাই হিলস এবং পশ্চিমে সমুদ্র। পরবর্তীকালে ১৭৬৩ সালে (১১৭০ মঘী সনের ৬ই শ্রাবণ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্রগ্রাম কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তা Mr. Henry Verelst কর্তৃক চাকমা রাজার শাসনাধীন রাজ্যের সীমানা বর্ণিত হয়েছে যে, " The local jurisdiction of Chakma Raja Shermust Khan is to be all the hills from Pheni

Dhaka University Institutional Repository

river to the Sangu and from Nizampur road to thee hills of kuki Raja". ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ সালে ভারত আগমন করেন। ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাবকে পরাজিত করে রাজ্য জয়ের সূচনা করে। অভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে বিভিন্ন রাজ্য জয়ের মাধ্যমে কালক্রমে বেনিয়া থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী অধিকৃত রাজ্য সমূহে কোম্পানীর শোষণ, শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। বৃটিশ সরকার ১৭৭২ সালে পার্লামেন্টে "রেগুলেটিং এ্যাক্ট ১৭৭২" পাশ করে ভারতের উক্ত রাজ্য সমূহের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে 'কার্পাস মহল' বা 'চাঁদিগাং রাজ্য' চাকমা রাজার শাসনাধীন ছিল।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে নতুন ভূমি রাজস্ব "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা' প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তা কার্যকর করেন। এ ব্যবস্থাধীন ভূমির উপর গ্রামবাসীদের যৌথ মালিকানা প্রথার অবসান হয় ও গড়ে উঠে ব্যক্তি মালিকানাস্বত্ব। ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে বিদ্রোহ হয়। বিট্রিশ সরকার কোম্পানী শাসনের পুরোপুরি অবসান ঘটিয়ে সমগ্র ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে ও অতঃপর শাসন সংস্কার শুরু করে। ১৮৬০ সালে "জেলা আইন-১৮৬০" প্রণয়ন করে সারা ভারতকে শত শত জেলায় বিভক্ত করে। উক্ত জেলা আইন অনুসরণে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার চাঁদিগাং বা চট্রগ্রামকে (ইংরেজীতে Chittagong) দুভাগে বিভক্ত করেন। সমতল অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকা 'চট্রগ্রাম জেলা'কে বাংলা প্রেসিডেন্সীর অর্ন্তভূক্ত করে। পাহাড়ী এলাকা নিয়ে গঠিত 'চট্রগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল' বা 'পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলা' বিট্রিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন রাখা হয়।[৫]

১৮৬১ সালে বিট্রিশ পার্লামেন্টে "ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১" (Indian council Act 1861) পাশ হয়। ১৮৭০ সালে "ভারত শাসন আইন ১৮৭০" বা Government of india Act (for Administration of the background Tracts), 1870 বিট্রিশ পার্লামেন্ট পাস হয়। এ সব আইনে ব্রিটিশ ভারত সরকারকে বিশেষ অঞ্চল শাসনের জন্য বিধি তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী গর্ভণর জেনারেল বহু বিধান প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ ভারত সরকার উপলব্দি করে যে, "জেলা আইন-১৮৬০" অনুসরণে পশ্চাদপদ আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা সমূহ চলতে পারছে না । অতঃপর ভারতীয় আইনসভা "তফসিল ভূক্ত জেলা আইন ১৮৭৪" (Scheduled Districts Act, XIV of 1874) পাস করে। এ আইন বলে বিশেষ অঞ্চল গুলোকে নির্দিষ্ট করে একটি তালিকা করা হয়। উক্ত তফসিল ভূক্ত জেলা আইন এর আওতায় অপরাপর বিভিন্ন জেলার সাথে পশ্চাদপদ ও সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্রগ্রামকে একটি তফসিল ভূক্ত জেলায় পরিণত করা হয়। মূলত "ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১"; "ভারত শাসন আইন ১৮৭০" ও "তফসিল ভূক্ত জেলা আইন ১৮৭৪" এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য সর্বপ্রথম Rules for the Territorial Circle in the CHT 1884 প্রবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

করে। এ নীতি বলে সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রামকে চাকমা, বোমাং, মং ও সংরক্ষিত বনায়ন সার্কেল হিসেবে বিভক্ত করে ২ বর্গ মাইলের কম নয় ও ১০ বর্গ মাইলের বেশি নয় এমন এলাকা নিয়ে মৌজা গঠন করা হয় এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।[৬]

১৯০০ সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার The CHT Regulation 1900 (1 of 1900) প্রণয়ন করে। এ শাসন বিধিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, ভূমি, রাজস্ব এবং বিচারিক ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক ছিলেন বাংলার গভর্ণরের প্রতিনিধি আর গভর্ণর ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি। এক কথায়, পার্বত্য চট্রগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন শাসিত হয়। তা কখনো বাংলার শাসনাধীন ছিল না। ফলে পার্বত্য চট্রগ্রামের শাসন, ভূমি, রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা বাংলার ব্যবস্থাদি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সার্কেল চীফ ও হেডম্যানদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া সমতল অঞ্চলে প্রচলিত কোন কোন আইন পার্বত্য চট্রগ্রামেও প্রযোজ্য হবে, কোন কোন আইন মোটেই প্রযোজ্য হবে না এবং কোন কোন আইন কি পরিমাণে বা কতটুকু প্রযোজ্য হবে ইত্যাদি মর্মে একটি লম্বা তফসিল উক্ত রেগুলেশনে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ১৯১৯ সালে " ভারত শাসন আইন ১৯১৯" প্রবর্তন করা হয়। উক্ত আইন বলে তফসিলভূক্ত জেলা আইনে উল্লেখিত অঞ্চলের তালিকা পুনর্বিবেচনা করে একটা নতুন তালিকা তৈরি করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tracts) এর তালিকা। এ অনগ্রসর অঞ্চলের তালিকায় ২ নং ক্রমিকে পার্বত্য চট্রগ্রামের নাম ছিল।[৭]

সারা ভারতে আরেক দফা বড় ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হয় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতীয়দের স্বাধীনতার আন্দোলনর দাবি অধিকতর জোরদার হওয়ার প্রেক্ষিতে "ভারত শাসন আইন ১৯৩৫" প্রবর্তন করা হয়। এ আইনেও অপরাপর অঞ্চলের সাথে পার্বত্য চট্রগ্রামকে শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে রাখা হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭" পাস হয় ও উক্ত আইনে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়। এ আইনে আদিবাসীদের শাসন বহির্ভূত এলাকা সমূহের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার বিধান ছিল। তদানুসারে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে "পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" ও " পৃথক শাসিত অঞ্চল " বা " উপজাতীয় অঞ্চল " এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসনবিধিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা দেশের সমতল অঞ্চলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণরুপে পৃথক। মূল পার্থক্য গুলো নিম্নরুপঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১। দেশের সাধারণ আইন "ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০" অনুসারে সরকার ভূমির মালিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" সাল অনুযায়ী সরকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserve Forest) এর মালিক। মৌজাধীন সকল ভূমির যৌথ মালিকানাসত্ব মৌজাবাসীর।

২। দেশের সাধারণ আইন "ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০" অনুসারে ব্যক্তি মালিকানাধীন বন্দোবস্তকৃত ভূমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারী ভূমি ব্যবহার অবৈধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যায়। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যতিত মৌজাধীন অন্যান্য ভূমিতে বসবাস ও চাষাবাদ মৌজাবাসীর জন্য বৈধ অধিকার।

৩। দেশের অপরাপর অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া আলাদা। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সার্কেল চীফ ও হেডম্যানগণ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত। দেশের সাধারণ আইনে বা ভূমি ব্যবস্থাপনায় তা নেই।[৮]

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এ আইনে পূর্বেকার পূর্বানোমোদন পদ্ধতি এবং জেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় "ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা" অন্তভূক্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বা অন্য কোন আইনের অসংগতি থাকলে উক্ত আইন সমূহ সংশোধণের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার অদ্যবধি তা বাস্তবায়ন করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। উক্ত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়।

ভূমি কমিশন ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও ভূমি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় সকল ও পরিসম্পদ সংবলিত কমিশনের কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। অনেকদিন ধরে ভূমি কমিশনের সচিবের পদ খালি রয়েছে। ২০০৬ সালে কমিশনের জন্য লোক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও পরে তা বাতিল করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। একই সঙ্গে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দান ও কমিশনরের জন্য পর্যাপ্ত পরিসম্পদ বরাদ্দ করে কমিশনের কার্যালয় শক্তিশালী ও সক্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসলেও ভূমি কমিশন আজও কার্যত অচল। তাছাড়া বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর অব্যাহতির পর প্রায় এক বছর ধরে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদটি খালি ছিল যা সরকারের চরম অবহেলার পরিচয় তুলে ধরেছে। পার্বত্য সমস্যা সমাধান করতে হলে ভূমির উপর পাহাড়ীদের ভূমির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কমিশনের যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি জরিপ ও সাম্প্রতিক সমস্যা ঃ

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় বলা হয়েছে "উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পূণর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যথাশ্রীর্ঘ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ বাছাইয়ের মাধ্যমে জায়গা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকরত উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।" অথচ ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে আরও জটিল ও দীর্ঘায়িত করছেন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রণীত ভূমি কমিশন আইনের মধ্যে অসামঞ্জস্য এর প্রধান কারণ। ২০০১ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কমিশনকে। ভূমি কমিশন আইনের ৬(৩) ধারা অনুযায়ী কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকারের কাছে ওই অঞ্চলের ভূমি জরিপ প্রতিবেদন চাইতে তথা জরিপ করার সুপারিশ করতে পারে। পাশাপাশি ভূমি কমিশন আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকদের কাছ থেকে আবেদন পত্রও চাইতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এ দুটি পদক্ষেপই নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও ভূমি জরিপ নিয়ে ভূমি কমিশন ও পার্বত্য উপজাতি নেতা-কর্মীর সাথে পারস্পরিক তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান। এই জটিলতা পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন ও সেখানকার ভূমি সমস্যার সমাধান নিশ্চিতভাবে বিলম্বিত করবে। এছাড়া বিষয়টি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ী বাঙালিদের মাঝে পারস্পরিক অসন্তোষ ও আরও অনেক নতুন জটিলতার সৃষ্টি করছে।

এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ভুমি কমিশন আইনে জরিপ আগে না পড়ে এমন কিছু বলা নেই। বলা আছে, কমিশন জরিপ প্রতিবেদন চাইতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। সে অনুযায়ী আমরা জরিপ করতে বলেছি। কারণ আমরা ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে তার জমি বুঝিয়ে দিতে চাই। কাজেই বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে যদি জরিপের কাজটা এগোয় তাহলে সুবিধা হয়।[৯]

কিন্তু জরিপকারীরা যদি কাউকে মালিক হিসাবে নির্ধারণ করেন আর সেই ব্যক্তি যদি প্রকৃত মালিক না হোন তাহলে তো প্রকৃত মালিক বঞ্চিত হতে পারেন। এমন প্রশ্নের জবাবে ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান বলেন, জরিপ অধিদপ্তরের মালিকানা নির্ধারণের একটি আইনি ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেটা ভূমি কমিশনের উপর বর্তায় না। কমিশন মালিকানা ঠিক করবে তার আইন ও বিচার অনুযায়ী কাজেই জরিপকারীরা একজনকে মালিক বললেই তিনি মালিক হয়ে যাবেন না। তাছাড়া কমিশন শুধু জরিপই করবে না, পাশাপাশি ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে আবেদন নিয়ে তা শুনানির জন্যও কমিশন জরিপ তৈরী করছে। তিনি আরও জানান এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার আবেদন কমিশনের কাছে জমা পড়েছে এবং প্রায় এক হাজার আবেদন শুনানির জন্য তৈরী হয়ে গেছে। শুনানির মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করে প্রকৃত মালিককে যেন নির্দিষ্ট জমি বুঝিয়ে দেয়া যায়, সে জন্যেই জরিপ দরকার।[১০]

এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার মতে, ভূমি জরিপের অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ভূমির ম্যাপিংসহ ভূমির মালিকানা ঠিক করা। কিন্তু শান্তি চুক্তি মোতাবেক আগে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি না করে এবং অভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসন ও প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের তাদের জমি প্রত্যাপন না করে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মোতাবেক পাহাড়ী জনগণের ভূমি রেকর্ডভুক্ত না করে ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত না করে ভূমি জরিপ করলে তা চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক। তাই চুক্তি অনুযায়ী পাহাড়ী অধিবাসীরা আগে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি এবং পাহাড়ে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের পর আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ভূমি জরিপ কাজ শুরু করার পক্ষে মত দেন।[১১]

এ প্রসঙ্গে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, ভূমি কমিশন ভূমি জরিপের অজুহাতে ভুমি বিরোধ নিস্পত্তি বন্ধ রাখা বা বিলম্বিত করা হবে দুঃখজনক। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, জরিপের সঙ্গে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই। ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী। সেটা না করে ভূমি জরিপের উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধকে দীর্ঘায়িত করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো জেএসএস; ইউপিডিএফ; জেএসএস (বিক্ষুব্ধ) প্রত্যেকেই চায় চুক্তি অনুযায়ী ভূমি জরিপের আগে শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসন। এদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, ভুমি বিরোধ নিস্পত্তির আগে ভূমি জরিপের ঘোষণা দিয়ে ভূমি কমিশন চুক্তির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ভূমি কমিশন তিন পার্বত্য জেলায় যেসব ভূমি নিয়ে বিরোধ নেই, সরকার সেই অবিরোধীয় ভূমি জরিপের উদ্যোগ নিতে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, অবিরোধীয় ভূমি জরিপ কেন প্রয়োজন, এর উদ্দেশ্য কি, তার কাছে তা স্পষ্ট নয়। নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, অবিরোধীয় ভূমি জরিপ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এমনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও মনে করে, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির সঙ্গে ভূমি জরিপের বিষয়টি একীভূত করা ঠিক নয়। ভূমি জরিপ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, জটিল ও সময় সাপেক্ষ কাজ। তাই ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি যদি ভূমি জরিপের উপর নির্ভরশীল হয় তবে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হবে।

জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জমির আয়তন, অবস্থান, সীমানা, ভৌগলিক বিবরণ ও দখলদারের নাম পরিচয় নির্ণয় করা হয়। কিন্তু ভূমি জরিপকালে ভূমির মালিকানা নিরুপণের প্রচলিত আইনের অধীনে জমির দখলদারীত্বের প্রকৃত মালিকানা স্বত্বের কাগজ পত্রাদি ও দালিলিক প্রমাণের বিষয়টি অনুপস্থিতি থাকে। তাই প্রথাগত আইনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ ছাড়া ভূমি কমিশন ভূমি জরিপ পরিচালনা করলে তা যথাযথভাবে সঠিক না হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে জমির মালিকানা নির্ধারণে জমির দখলদার ও আইন বা দালিলিক স্বত্ব অনুযায়ী মালিক অথচ দখল না থাকা জমি নিয়ে নতুন করে বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। জরিপের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে জমির অবৈধ দখলদারের স্বত্বেরও স্বীকৃতি দেয়া হয়। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি আগে সমাধান না করে, ভূমি জরিপ পরিচালনা করলে, দখলে নেই অথচ বৈধ স্বত্ব আছে, এরুপ ব্যক্তিদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ :

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার যে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল তাও পরবর্তীতে উপজাতিদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। ২০০১ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) তত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ তড়িঘড়ি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাস করে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ধারা অর্ন্তভূক্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সেসব ধারা সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশমালা পেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে আইন মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক পরিষদের সাথে বৈঠক করে সমঝোতায় উপনীত হয় এবং ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে ভেটিং প্রদান করে মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে উক্ত আইনের সংশোধন সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি দলের সাথে তদানীন্তন বি,এন,পি, সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইঁয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

সভায় আলোচনা উত্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, সরকার উক্ত আইন সংশোধনের সদিচ্ছা পোষণ করলেও পরবর্তীতে আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়নি। বরং চুক্তি সম্পাদনকালে বি,এন,পি'র বিরোধিতার কারণে তৎকালীন সরকারের (২০০২-২০০৭) সময়ে উক্ত আইন সংশোধন করার সম্ভাবনা ছিল না।[১৩]

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত পরামর্শ ও সুপারিশমালা গ্রহণ না করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ আইন পাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্বক ১৯ টি বিষয় রয়েছে। ফলে এই আইনে চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্বক বিষয় রয়ে যায়, যা চুক্তি ও জুম্ম জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় রাজনৈতিক দল গুলোর নেতারা ও স্থানীয় সুধীজন মনে করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ২০০১ সালের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্বক ধারা গুলো সংশোধন করা। তারা মনে করেন, আইনের বিরোধাত্বক ধারা গুলো সংশোধন না করলে ভূমি সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় পার্বত্যবাসী আশা করে যে, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করা হোক।[১৪] বিরোধাত্মক বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

১। আইনের ২(চ) ধারাতে "পূনর্বাসিত শরণার্থী" অর্থ বলা হয়েছে যে, ৯ই মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী। এই বিধান দ্বারা কেবলমাত্র ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসা শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিস্পত্তির আওতায় পড়বে। ১৯৯২ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ১৬ দফা চুক্তির আওতায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিস্পত্তির আওতায় পড়বে না।

২। চুক্তিতে প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেসব জায়গা জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভুমি বিরোধ নিস্পত্তি বিধান করা হয়। কিন্তু ভুমি কমিশন আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১) (ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র "পূণর্বাসিত শরণার্থী" ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিস্পন্ন থেকে যাবে।

৩। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত "আইন, রীতি ও পদ্ধতি" অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬ (১) (খ) ধারায় কেবলমাত্র " আইন ও রীতি" উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কাপ্তাই হ্রদের "জলেভাষা জমি" (Fringe Land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে। চুক্তিতে "জলেভাষা জমি" বিরোধ নিস্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও ভূমি কমিশন আইনে "জলেভাষা জমি"র কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫। কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনরে ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে, "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভূক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হইবে"- এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৬। কমিশনের সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তির ১৩(১)(২) ধারাতে "পার্বত্য চট্রগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদ ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে" এই ধারা সংযোজন করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' অনুচ্ছেদের ২নং ধারা এবং ভূমি কমিশন আইন ২০০১ এর আইনের (৬/৩ ও ৯ ধারা) মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সেটাই ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির পূর্বে ভূমি জরিপ পরিচালনা করার জন্য দায়ী। সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সালে পাস করে। এর পরই জনসংহতি সমিতি চুক্তি ও আইনের অসামঞ্জস্য গুলো দূর করতে সংশোধনী প্রস্তাব দেয়। সে অনুযায়ী যথাসময়ে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন হলে, আজকের এই বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

বর্তমানে অওয়ামী লীগ সরকার ভূমি কমিশন আইনের কিছু কিছু ধারা সংশোধন করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সময়ের কালক্ষেপন করছে। সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় কমিশন আইনের ছয়টি ধারা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার সম্প্রতি আইনের তিনটি ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে কমিশন আইনের এই তিনটি ধারা সংশোধন করতে একটি অবস্থানপত্র তৈরি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি ও জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে এই সব আইনের সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সংশোধিত আইন দ্রুত জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আঞ্চলিক পরিষদ ভূমি কমিশন আইন, ২০০১ এর মোট ২৩ টি ধারা সংশোধনের সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে প্রস্তাব সংশোধনের জন্য ইতিপূর্বে এক সভায় মতৈক্য হয়। এরই ধরাবাহিকতায় সরকার ৩টি

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে। যে সব ধারা সংশোধন হচ্ছে: আইনের ধারা ৬ (১) ক, গ ও ৬ (১) (গ) এর শর্তাংশ সংশোধন ও সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

আইনের ৬ (১) (ক) তে বলা হয়েছে, "আইন, রীতি ও পদ্ধতি" অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬ (১১) (খ) ধারায় কেবলমাত্র "আইন ও রীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারা সংশোধন করে পূনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয় বিরোধ নিষ্পত্তি করা ছাড়াও অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া সব ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

ধারা (৬) (১) (গ) তে বলা আছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বহির্ভূতভাবে কোন বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক হতে বেদখল হয়ে থাকলে তার দখল পুণর্বহাল করা। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে ক্রিজ ল্যান্ড সহ (জলে ভাসা জমি) কোন ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া বা বেদখল করা হয়ে থাকলে তার দখল পুণর্বহাল করা। এই ধারার শতাংশে বলা হয়েছে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণ করা ভূমি এবং রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপধারা প্রযোজ্য হবে না। এই তিনটি সংশোধনীই আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাব।[১৫]

তবে ভূমি মন্ত্রণালয় যে ধারাগুলো সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ গুলো তাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করেছে। ভূমি কমিশনের সমস্যা সম্পর্কে রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, আরও অন্তত তিনটি ধারা সংশোধন করা অত্যাবশ্যক। এগুলো হচ্ছে-

এক, ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান এর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিধান রহিত করা। কমিশনারে সভায় কোন বিষয়ে একমত না হলে সে বিষয়ে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত এ ধারা পরিবর্তন করা।

দুই, চেয়ারম্যান সহ কমিশনের তিন সদস্য উপস্থিত থাকলেই কোরাম হওয়ার বিধানে পরিবর্তন করা। তা না হলে চেয়ারম্যান ও দুজন সরকারী সদস্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত থাকলেই কোরাম হয়। তিন রাজা (চাকমা রাজা, মং রাজা, বোমাং রাজা) ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানদের একজনও উপস্থিত না থাকলেও সভা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কাজেই ভূমি কমিশনের সভায় কোরাম হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজা বা প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতি আবশ্যকীয় করতে হবে।

তিন, কমিশনের সভায় তিন রাজার প্রতিনিধি পাঠানোর বিধান করতে হবে। কারণ চাকমা রাজা জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক কমিটি সহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থার সদস্য। উক্ত সংস্থাগুলোর কাজ ও সাধারণ সভায় তার

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিতির কারণে চাকমা রাজাকে প্রায়ই দেশের বাইরে থাকতে হয়। বোমাং রাজা দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। তার প্রতিনিধি হিসেবে সব কাজ পরিচালনা করেন তার ছেলে। বর্তমান মং রাজা (উত্তরাধিকার সূত্রে নির্বাচিত) কলেজের ছাত্র যার জমি জমা বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম। কাজেই ভূমি কমিশনের সভায় বিভাগীয় কমিশনার ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এর মতো এই তিন রাজারও প্রতিনিধি পাঠানোর বিধান করা জরুরী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা না করে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন পাস করায় একদিকে এটি যেমন শান্তিচুক্তির লংঘন অপরদিকে এই আইনটি ভূমি সমস্যা সমাধানকে দীর্ঘায়িত করেছে। যদি চুক্তি অনুযায়ী সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন পাস করতো তবে এটি পার্বত্যবাসীদের দাবি-দাওয়াকে ধারণ করে ভূমি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো।

পার্বত্য অঞ্চলে জমির ইজারা, অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর প্রসঙ্গ :

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ এর আওতাধীন পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্যতম কার্য ও দায়িত্বের অংশ ছিল ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা। পার্বত্য চট্টগ্রম চুক্তি এর খ- ২৬ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের জমির ইজারা অধিগ্রহণ, হস্তান্তর প্রসঙ্গে পরিষদকে নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি সহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forest), জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাবর্ত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না। কিন্তু ২৬ নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি সহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। বাস্তবে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকেই পার্বত্য এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করে শান্তিচুক্তি লংঘন করেছে। সরকার ২৮ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে বনায়ন, মিলিটারী ব্যারাক, আর্টিলারী ও বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য। এই অধিগ্রহণের ফলে ৫ হাজারের অধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া সরকার পার্বত্য এলাকায় একটি সার কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স ও অনুমোদন দিয়েও শান্তিচুক্তি লংঘন করেছে, কেননা চুক্তি অনুযায়ী ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত।[১৬]

চুক্তির ৩৪ (ক) ধারা মোতাবেক "ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা" পার্বত্য জেলা পরিষদ আওতাধীন বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণ না করে ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং সেনাক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বন বিভাগও সমান ভাবে জনবসতিপূর্ণ এলাকা গুলো সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা দিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার আওতাধীন দীঘিনালায় ছয়টি মৌজায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার একর জমিকে বন বিভাগ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করেছে। এ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার আগে স্থানীয় অধিবাসী, হেডম্যান বা মৌজা প্রধান, আঞ্চলিক পরিষদ কারও সাথেই আলোচনা করা হয় না যা পার্বত্য চুক্তির লংঘন ও চুক্তির পরিপন্থী। এ ধরনের অধিগ্রহণের ভয়ে স্থানীয় উপজাতি পরিবার গুলো সর্বদা উচ্ছেদ আতংকে জীবন যাপন করছে। তাছাড়া উচ্ছেদ পরবর্তীকালে উচ্ছেদ পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ সহায়তা দেয়া হয় না।[১৭]

উনিশ শতকের শেষ ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সার্কেলে আবার কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত। এসব মৌজার প্রধান হেডম্যানরাই ঐতিহ্যগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয় গুলো দেখাশোনা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি অধিগ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়ে মৌজা প্রধানের প্রতিবেদন ছাড়া জমি হস্তান্তর করা যাবে না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনানিবাস সম্প্রসারণের নামে যে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হেডম্যানের মতামত নেওয়া তো হয়নি বরং হেডম্যানেরাও আজ ভুমি আগ্রাসনের শিকার।[১৮] সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরুপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসীরা নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন করে বান্দরবনে রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফল বাগান সহ হর্টিকালচারের নামে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যাক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদী ভূমি লীজ দেয়া হচ্ছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। বান্দরবন সদর, লামা ,আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫ টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট এর বিপরীতে প্রতি প্লট পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের মতে বান্দরবন জেলায় ১,৮৭৭ প্লটের বিপরীতে প্রায় ৪৬,৭৫০ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে।

নিম্নের সারণীতে তা দেখানো হয়েছে : [১৯]

ক্রঃ	উপজেলার নাম	রাবার প্লান্টেশন		হর্টিকালচার		মোট	
		প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি একর
১.	বান্দরবান সদর	৯১	২,২৭৫	১১৯	২,৮৫৫	২১০	৫,১৩০
২.	লামা	৮৩৫	২০,৮৭৫	১৭৭	৪,৫০০	১০১২	২৫,৩৭৫
৩.	আলিকদম	১৯৪	৪,৮৪৭	৬২	১,৫৫০	২৫৬	৬,৩৯৭
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২	২,৮০০	১৫	৩৭৫	১২৭	৩,১৭৫
মোট ৪ টি উপজেলায়		১,২৩২	৩০,৭৯৭	৩৭৩	৯,২৮০	১,৬০৫	৪০,০৭৭

গত ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবন জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন থেকে আংশিকভাবে বন সৃজিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট নিয়ে ইজারা বাতিল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইজারাদাররা অসাধু তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে সেনানিবাস রয়েছে, সেখানে সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ভূমির অধিগ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। অতিসম্প্রতি রুমা সেনানিবাসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত জায়গা-জমি থেকে ম্রো অধিবাসী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। অপরদিকে রুমা

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলায় পলি মৌজাধীন থানা পাড়ায় বি,ডি,আর (বর্তমানে বিজিবি) ব্যাটিলিয়ন হেডকোয়ার্টের স্থাপনের জন্য ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এই হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলে থানা পাড়ায় ৪০ পরিবার, বড়শিপাড়ায় ১৫ পরিবার এবং উপর ও নীচের রুমাচর পাড়ায় ৫০ পরিবার মারমা উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙা উপজেলাধীন পলাশপুর বি,ডি,আর (বর্তমানে বিজিবি) ক্যাম্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে পাহাড়ী ও বাঙালিদের প্রায় ১০০ একরাধিক জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে উক্ত জমির সীমা নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে করে অনেক স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালি উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তম্মধ্যে কেবল মাত্র বান্দরবন এ রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্রগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। বংশ পরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে খিয়াং উপজাতিরা পরবাসী হয়ে পড়েছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের একটি চিত্র শুধুমাত্র বান্দরবন জেলার প্রেক্ষিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ [২০]

ক্রঃ	বিবরণ	জমি (একর)
১.	সুয়ালকে গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণ কৃত	১১,৪৪৫.৪৫
২.	সুয়ালক গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রক্রিয়াধীন	১৯,০০০.০০
৩.	রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণ	৯,৫৬০.০০
৪.	টংকাবতিতে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনির পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন	৫,৫০০.০০
৫.	বান্দরবান- লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	২৬,০০০.০০
৬.	বিডিআর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার (রুমা উপজেলাধীন পলি মৌজা)	২৫.০০
৭.	বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারন চুড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন	১৮১.০০
	মোট জমির পরিমাণ	৭১,৭১১.৪৫

রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য সরকারী ভাবে নয় হাজার ছয়শত একর জমি অধিগ্রহণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এর ফলে ওই এলাকার তিনটি মৌজার অধিকাংশ স্থায়ী বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে। এই অধিগ্রহণের কারণে বান্দরবন জেলার রুমা উপজেলার উপজাতিরা লংমার্চ করে তারা প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি পেশ করেন। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এক জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমানে আরও যুক্ত হয়েছে রুমা বাজার সংলগ্ন পলি মৌজায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) জন্য আরও অতিরিক্ত তিন হাজার একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, যা সরকার এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির ইজারা বাতিলকরণ উদ্যোগ ও বাস্তবতা:

পার্বত্য চুক্তির ঘ-৮ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বরাদ্দকৃত রাবার চাষে ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "যে সকল অ-উপজাতীয় ও স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে"। কিন্তু সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও বান্দরবন জেলা প্রশাসক কর্তৃক দাবি করা হয় ৫৯৩ টি প্লট বাতিল করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কোন প্লট থেকেই এখনো কোন ইজারাদার ভূমি ছেড়ে দেয়নি। বরং বহাল তবিয়তে আরো পূর্ণ উদ্যেমে জায়গা-জমি দখল পূর্বক বাগান সৃজন করে চলছে এবং জম্মুদের তাদের বাস্তুভিটা, বাগান-বাগিচা ও জুম ভূমি ছেড়ে যেতে হুমকি দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে উপজাতিদের উপর হামলাও চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে অধিকাংশ ইজারাদার ইজারা পুণর্বহালের দাবি জানিয়ে আবেদন করছে এবং তদানুসারে পুণর্বহালও করা হচ্ছে। বান্দরবনে ইজারাদারদের জোরপূর্বক ভূমি বেদখল মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। উদাহারণ স্বরুপ বান্দারবন সদর উপজেলার টংকাবর্তী ইউনিয়নাধীন রঞ্জুপাড়া, পেনাইপাড়া, চাক্কেইপাড়া ও বাট্যাপাড়ায় সংখ্যালঘু ম্রো জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০০ পরিবারকে চলে যেতে ভূমি ইজারাদাররা হুমকি দিয়ে চলছে। অপরদিকে ১ জুলাই ২০০৯ বহিরাগত বাঙালি লীজ মালিকরা বান্দরবন সদর উপজেলার লেমু পালং মৌজা ও দুলুছড়ি মৌজাধীন ১২ গ্রামের ২২৮ পরিবার ম্রো গ্রামবাসীকে ইজারাদার এলাকা ছাড়ার হুমকি দেয়। এ ব্যাপারে ম্রো গ্রামবাসী ন্যায় বিচার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আজ অবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।[২২]

পার্বত্য চট্রগ্রামে ভূমির দখল ও ইজারা এক ধরণের নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে। ক্ষমতা, পেশী শক্তি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এখানে ভূমি দখল ও ইজারা দেয়া হচ্ছে যা চুক্তির লংঘন। পার্বত্য চট্রগ্রামে শুধু সরকারী ভাবে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে তা নয় সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, অবসর প্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, শিল্পপতি, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা পার্বত্য চট্রগ্রামের হাজার হাজার একর জমি ইজারা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অজুহাতে অনেক এন,জি,ও পার্বত্য উপজাতিদের ভূমি দখল করে চলেছে। বহিরাগত বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত ডেভেলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্যা রুরাল পুওর (ডর্প) (Development Organisation of the Rural Poor) নামে একটি এন,জি,ও'কে বান্দরবন জেলার সরই ইউনিয়নের টঙ্গোঝিরি এলাকায় উপজাতিদের ভূমি ইজারা নিয়ে বাগান বাগিচা গড়ে তুলেছে। ২০০৮ সালের মে মাসে ডর্পের লোকজন ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের গড়ে তোলা এসব বাগান- বাগিচা কেটে আগুন লাগিয়ে পরিস্কার করে এবং সেখানে 'ডর্প স্বাস্থ্য পল্লী' নামে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। অনুরুপভাবে ডেসটিনি-২০০০ নামে বহুমূখী বাজারজাত কোম্পানী উপজাতিদের জায়গা-জমি দখল করে এবং ইজারা দেওয়া জমি-জমা ক্রয় করে বান্দরবন সদর উপজেলার চেমি

Dhaka University Institutional Repository

ভুলু পাড়া এলাকায় বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ডেসটিনি উক্ত বনায়ন প্রকল্প দেখিয়ে সমগ্র দেশের ট্রি প্লান্টেশন গ্রহণের অধীনে বিভিন্ন মেয়াদী বীমায় অর্থ সংগ্রহ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় জুম চাষীরা যখন তাদের প্রাপ্য ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেসটিনির এই বনায়ন কার্যক্রম কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক তা বিবেচনার বিষয়।[২৩]

তাছাড়া দেশের সমতল জেলা গুলোতে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা দেওয়া লাগে না। কেবল উন্নয়ন কর দিতে হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির খাজনা দিতে হয়। উন্নয়ন করও দিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সরকারের উচিত এই বৈষম্য দূর করা।[২৪] পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির জবর দখল, অধিগ্রহণ, ইজারা বাণিজ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরেও অব্যাহত রয়েছে। সরকার নিজেও চুক্তি সম্পাদনের পরেও আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা না করেই জমি অধিগ্রহণ করে চলেছে। চুক্তি সম্পাদনের ১৬ বছরেও উপজাতি শরণার্থীরা তাদের বাস্তভিটায় ফিরতে পারেনি। ভূমি সমস্যা শুনানির মাধ্যমে উপজাতিদের ভূমি শরণার্থীদের কাছে ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ অনুপস্থিত। শুধুমাত্র ভূমি কমিশন আইন সংশোধনেই পার হয়ে গেল পুরো এক যুগ। তাই সংযত কারণেই প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক আদৌ সরকার পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হবে নাকি তা চুক্তিতেই আবদ্ধ থেকে যাবে।

পার্বত্য চুক্তিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ তার সার্থকতা নির্ভর করে উপজাতিরা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফলসমূহ নিশ্চিত করতে পারছে কিনা। আর চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ উপজাতিদের মাঝে যে সকল অধিকার উপভোগের সুযোগ তৈরী করবে তার মধ্যে ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার অন্যতম। কিন্তু চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ, দখল, ইজারা প্রভৃতি উপজাতিদের আতংকিত করে তোলে। উপজাতি শরণার্থীরা আজও তাদের বাস্তুভিটায় ফিরতে পারেনি। উপজাতিদের দখলকৃত জমি উদ্ধার করে তাদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব স্থানীয় উপজাতিদের বাস্তুভিটা থেকে জোরপূর্বক দখল, উচ্ছেদ ঠেকাতে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং অঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। একদিকে ভূমি কমিশনের ভূমি সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উদ্যোগের অনুপস্থিতি অন্যদিকে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষতায়নের অভাব উভয়ই কারণেই পার্বত্য উপজাতিরা ভূমির উপর তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পার্বত্য ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে পরোক্ষভাবে আরও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপজাতিদের ভূমি ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারকে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই। ফলশ্রুতিতে ভূমি সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. *Chowdhury, R.I, et al (1979), Tribal leadership and political Integration: A case study of Chakma and Mong of Chittagong Hill Tracts, , Faculty of Social Science. Chittagomg. University of Chittagong.*

২. Nasreen, Z., & Togawa, M. (1985). Politics of Development: 'Pahari-Bengali' Discourse in the Chittagong Hilltracts. p103.

৩. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*। পৃ -৩৩-৩৪, ঢাকা : সন্দেশ।

৪. Nasreen, Z., & Togawa, M. (1985). p104, op.cit.

৫. চাকমা, গৌতম কুমার (২০০৫)। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভুমি সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে ভুমি বিরোধ। ক্রোড়পত্র সংকলন : পার্বত্য চট্টগ্রামের ভুমি অধিকার শীর্ষক কর্মশালা।

৬. পূর্বোক্ত পৃ-১৮।

৭. পূর্বোক্ত পৃ-১৯।

৮. পূর্বোক্ত পৃ-১৯।

৯. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১০. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১১. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১২. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১৩. চাকমা, গৌতম কুমার (২০০৫)। op.cit.

১৪. চাকমা, মঙ্গল কুমার (২০০৯, সেপ্টেম্বর ২৪)। *দৈনিক প্রথম আলো*।

১৫. ২৮ মার্চ ২০১১, *দৈনিক প্রথম আলো*।

১৬. Chowdhury, N. J. (2009). The Chittagong Hill Tracts Accord Implementation in Bangladesh : Ideals & Realities. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, Volume : XXVNo 2.

১৭. দেওয়ান, ইলিরা (২০১১, মে ১৫)। *দৈনিক প্রথম আলো*।

১৮. পূর্বোক্ত।

১৯. চাকমা, গৌতম কুমার (২০০৫)। op.cit.

২০. পূর্বোক্ত।

২১. দেওয়ান, ইলিরা (২০১১, মে ১৫)। *দৈনিক প্রথম আলো*।

Dhaka University Institutional Repository

২২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ক্রোড়পত্র (২০১০, নভেম্বর ১০)। পৃ-৫২-৫২, তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি : রাঙামাটি।

২৩. পূর্বোক্ত পৃ-৫৩।

২৪. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। *জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়*। পৃ- ১০০, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

৫ অধ্যায়

জাতীয় নিরাপত্তা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ

প্রতিটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। তদ্রুপভাবে বাংলাদেশেও তার সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অপরিসীম অবদান রেখে আসছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের সেনাবাহিনীর আছে গৌরবজ্জল ভূমিকা ও অবদান। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমে সেনাহিনীর অংশগ্রহণ ও সাফল্য বাংলাদেশকে বিশেষ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। অথচ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশ্নবিদ্ধ। পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান, অস্থায়ী সকল সেনাছাউনী প্রত্যাহার নিয়ে বহুদিন ধরে পার্বত্য উপজাতিরা সেনাবাহিনীর সমালোচনা করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় দেশের আরও কিছু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা যেমন মধুপুরে গারো সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় ঘাটাইল সেনানিবাস (টাঙ্গাইল) ও ময়মনসিংহ সেনানিবাস; সিলেটের সাঁওতাল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সিলেট সেনানিবাস স্থাপনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অবস্থান ও কার্যক্রম স্বাভাবিক হলেও স্বভাবতই প্রশ্ন আসে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে 'সেনাবাহিনী ও সেনানিবাস' স্থাপন কেন প্রশ্নবিদ্ধ ?

সীমান্তবর্তী এলাকা বিবেচনা ছাড়াও যৌক্তিক কারণেই পার্বত্য চট্রগ্রামে দেশের অপরাপর স্থানের ন্যায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম থাকতে পারে। ভৌগলিক অবস্থান, সীমান্তবর্তী এলাকা, ঘন অরণ্য, অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভুমিকাকে যৌক্তিক মনে করা হলেও এর পক্ষে-বিপক্ষে আছে ভিন্ন মতামত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রয়েছে গৌরবজ্জল ইতিহাস। অথচ সেই সেনাবাহিনীই ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্রগ্রাম অবস্থান ইস্যুতে পার্বত্য উপজাতিরা তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতা ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলে অসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবিধ প্রচারণা, ক্রোড়পত্র, লেখায় উঠে এসেছে সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য উপজাতিদের উপর শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান কেন পার্বত্য উপজাতিদের আতংকিত করে তোলে তার পিছনে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পার্বত্য উপজাতিদের দাবি গুলোকে অবহেলিত করা হলে, পার্বত্যবাসীরা সশস্ত্র অন্দোলনের পথ বেছে নেয় ঠিক তখন তদানীন্তন সরকার সমূহও পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক বিবেচনার চেয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগে পাহাড়ীদের অন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর মতো একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতিয়ার হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয়। উপরোন্ত আশির দশকে পাহাড়ে স্থানান্তরিত বাঙালিদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত হওয়ায় পাহাড়ীরা সেনাবাহিনীকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করতে থাকে। সেনাবাহিনীকে পাহাড়ীরা দুইভাবে প্রতিপক্ষ ভাবতে থাকে। এক, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের শত্রু হিসাবে দুই, পাহাড়ে স্থানান্তরিত

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের মিত্র হিসাবে। তাছাড়া স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে দেয়া হলে উপজাতিরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আনে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান এই সকল কারণে পাহাড়ীদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা তাই আংশিক ব্যতিক্রম ও সেই সাথে প্রশ্নবিদ্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি নেতারা সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারের দাবি করে আসছেন। দেশের অন্যান্য স্থানে আইন শৃঙ্খলা যদি পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও সেনাবাহিনীর স্থলে শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কথা বলে আসছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সকল অস্থায়ী সেনানিবাস অপসারণ ও স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও অস্থায়ী সেনাছাউনী প্রত্যাহার সহ, স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে ব্যবহার করা যায়নি। পার্বত্য চুক্তির পূর্বে ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ব্যবহার, সেনাবাহিনীর বর্তমান ভূমিকা কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের সাথে প্রাসঙ্গিক তা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে।

পার্বত্য চট্রগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ

পার্বত্য চট্রগ্রামের ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান অনস্বীকার্য। ভৌগলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক পরিবেশ একটি দেশের জাতীয় শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। একটি দেশ যদি তার ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশকে পরিকল্পিত বা কৌশলীভাবে পরিচালনা করতে পারে তবে তার জাতীয় নিরাপত্তাকে আরো সুরক্ষিত করতে পারে। অপরদিকে দক্ষ পরিচালানার অভাবে একটি দেশ আরো বেশি অরক্ষিত অথবা প্রতিপক্ষের হুমকি হিসাবে দেখা দিতে পারে।[১]

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও তার ভৌগলিক অবস্থান ও বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে এর গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি, যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে পাশ্ববর্তী বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও চীন পরস্পরে পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্বের ায়ুযুদ্ধের দুই মহা শক্তিধর রাষ্ট্র রাশিয়া ও আমেরিকা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সমর্থন প্রশ্নে পরস্পরের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান পাশ্ববর্তী প্রতিবেশি দেশগুলো ভারত, মায়ানমার ও চীনের রাজনৈতিক তৎপরতারও অন্যতম বিষয়। বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আঞ্চলিক এবং বহিঃ আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে

Dhaka University Institutional Repository

চলছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নিরুপভাবে অনুধাবন করা যায়।

প্রথমত, পার্বত্য চট্রগ্রাম একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। তার এক পাশে ভারত অন্য পাশে মায়ানমার। পার্বত্য চট্রগ্রাম দিয়ে সহজেই বঙ্গোপসাগরে অবতরণ করা যায়। আর বঙ্গোপসাগর পার্বত্য চট্রগ্রামের নিকটবর্তী হওয়ায় খুব সহজেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা যায়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্রগ্রাম সংলগ্ন কর্ণফুলী ও নাফ নদী দিয়ে সরাসরি মায়ানমারের সাথে যোগযোগ স্থাপন সম্ভব। বান্দরবন সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারে কোচিন ও আরাকানরা দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন এসব সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপের অবস্থান পার্বত্য চট্রগ্রামকে বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব দান করেছে।[২]

দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসাগরে প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থলে অবস্থিত পার্বত্য চট্রগ্রাম অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগলিক অবস্থানে দাড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের অবস্থান তিনটি ভূ-অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব বলয়ে অবস্থান। এই তিনটি অর্থনৈতিক শক্তি হচ্ছে ভারত, চীন এবং আসিয়ানভূক্ত অঞ্চল। পার্বত্য চট্রগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্য স্থানে অবস্থিত।[৩]

তৃতীয়ত, সমস্ত পার্বত্য চট্রগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান যোগযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ প্রতিকূল বিধায় সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে বাংলাদেশের সরকারকে বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। পার্বত্য চট্রগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ এবং দীর্ঘায়তন। প্রস্তের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েক গুণ বেশি দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রাম কক্সবাজার অঞ্চল সহ বাংলাদেশর বৃহত্তম ভূ-ভাগ থেকে একটি অভিক্ষেপিত ভূ-ভাগ।[৪] বাংলাদেশকে তার জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পার্বত্য চট্রগ্রামের এসব ভূ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল দিক গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়।

চতুর্থত, পার্বত্য চট্রগ্রাম ভূ-রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্ব বহন করে। পার্বত্য চট্রগ্রামের পশ্চিমের বাংলাদেশের একমাত্র ঘনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর পূর্ব কিংবা দক্ষিণ পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভূক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চল সমূহ অত্যন্ত দুর্গম, পাহাড়-পর্বত ও বনাবৃত এবং জনবিরল অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র।[৫] ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে দুর্গম, অনুন্নত ও অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আঞ্চলিক -আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রভাব সমূহ ঃ

ভারতের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের সাথে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত সংযুক্ত। ভারতের এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। অনেক চেষ্টা করেও ভারত এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব এলাকার কোন কোন রাজ্য স্বাধীনতার নামে কয়েক দশক ধরে লড়াই করে চলছে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামে উলফা (United Liberation Front of Assam); ত্রিপুরায় এন,এল,এফ,টি (United Liberation Front of Tripura); নাগাল্যান্ডে এন,এস,সি,এন (Nationalist Socialist Council Of Nagaland); মিজোরাম ও মনিপুরেও দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সব বিদ্রোহ গুলোকে উৎসাহিত অথবা বিদ্রোহ দমনে ভারতকে সহায়তা করতে পারে। ভারতও উক্ত এলাকার বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা কামনা করতে পারে। অন্য দিকে ভারত পার্বত্য বিদ্রোহে পৃষ্টপোষকতা ও মদদ দিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

মায়ানমারের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও মায়ানমার পরস্পর সীমান্তবর্তী হওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। স্বভাবতই বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অর্থ্যাৎ শান কোচিন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। ফলে মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাংলাদেশ বিশেষ করে দুটি বহিঃ উপাদানকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। দুটিরই সূত্রপাত দুই প্রতিবেশি দেশ ভারত এবং মায়ানমার থেকে। ১৯৯১ সালে সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণ, রোহিঙ্গা সমস্যা এবং ২০০০ সালে মায়ানমারের সাথে সীমান্ত সংঘর্ষ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকেও বিষয়টি উদ্বেগের বিশেষ কারণ।

মায়ানমার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতিকে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করেছিল এ ধরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে মায়ানমারের ভূ-খন্ডকে বিভিন্ন সময়ে শান্তি বাহিনীকে মদদ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন, ১৯৭৪ সালে রাজা ত্রিদিব রায় যখন বার্মাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন তিনি সন্তু লারমাকে পাকিস্তানের সাহায্য হিসাবে এক লাখ টাকা হস্তান্তর করেন।[৬] তাছাড়া বিগত ৩ মে ১৯৯৭ সালে বান্দরবনের

Dhaka University Institutional Repository

থানছি বি,ডি,আর (বর্তমানে বি,জি,বি) ক্যাম্পে একদল বিদ্রোহী সশস্ত্র হামলা চালায় এবং চারঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ হয়। এতে একজন বি,ডি,আর সদস্য ও দুইজন বিদ্রোহী নিহত হয়। পরে দুইজন বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারকৃতরা জানায় থানছি আক্রমনের পূর্বে ২৮ এপ্রিল ড্রাই ক্যাং পাড়ায় বান্দরবন জেলাতে এক সভা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা স্বীকার করেছিল যে, তাদের সাথে মায়ানমারের আরাকান লিবারেশন পার্টির বিদ্রোহী গ্রুপের যোগাযোগ রয়েছে।[৭]

এছাড়া মায়ানমারের অনেক গুলো বিদ্রোহী গ্রুপ যেমন: R.SO (Rohingya Solidarity Organization), ARNO (Arakan Rohingya National Organization) নামে কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন জেলায় গভীর অরণ্যে ঘাঁটি রয়েছে।[৮] অভিযোগ রয়েছে যে পাইকারী ঘুনধুম বাইশকাড়ি দোদড়ি এলাকায় সীমান্ত সংলগ্ন গহীন অরণ্যে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ঘাঁটি রয়েছে। তাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগাযোগ রয়েছে।[৯]

চীনের আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রভাব ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চীনের নিকট বাংলাদেশের ভূ কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। চীন দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ গুলোকে ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনার জন্য বিবেচনা করে থাকে।[১০] সে কারণে চীন দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ সমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার ও নেপালকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।[১১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের শুরুতে চীনের হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল তখন চীন গোপনে তাদের সহায়তা করেছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন।[১২] বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর The future of Bangladesh নামক প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহে চীনের হাত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৩] মায়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পুশ ইন করার চেষ্টা ও পরবর্তীতে রোহিঙ্গা সমস্যা সামাধানে বাংলাদেশ চীনের হস্তক্ষেপ ও সহায়তার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে চীনের রাজনৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রভাব ঃ

ভৌগলিক অবস্থান জনিত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার বিশাল ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্টের একটি বেসরকারী কোম্পানী চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দরে একটি বেসরকারী টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহী। আমেরিকার তেল ও গ্যাস কোম্পানি গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনিয়োগে আগ্রহী এবং এসব কোম্পানী গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল পরিবেশ চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি নিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ ব্লক নং ২২ এ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান করবে আমেরিকার কোম্পানী (United Maritime Bangladesh Ltd)। উল্লেখ্য আমেরিকার এসব তেল কোম্পানী গুলো আমেরিকার ও বিনিয়োগকৃত দেশের জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তারা যে কোন সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। যদি কোন কারণে তেল, গ্যাস উত্তোলনকারী এসব বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে তবে তারা প্রত্যেক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

তাছাড়া তেল, গ্যাস উত্তোলনে বিদেশী বিনিয়োগকারী ও বিশেষজ্ঞদের জানমালের নিরাপত্তা, তেল-গ্যাস আবিস্কৃত হলে তার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, প্রকল্পে পাহাড়ী-বাঙালিদের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিত করতে কোন কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হলে জরুরী নিরাপত্তা বিধান করা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের একার পক্ষে অসম্ভব হতে পারে। আর তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থানের এটি একটি অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত।

সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দাতাগোষ্ঠী সমূহ এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। অপ্রতুল ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দাতাগোষ্ঠী; এন,জি,ও সমূহ আসলে কোন সূদুর প্রসারী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে কিনা অথবা তাদের নিরাপত্তা বিধানও একটি অন্যতম বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে মায়ানমার বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন জেলাতে মায়ানমারের ও ভারতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গোষ্ঠী গুলো রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘটাতে সহায়তা করতে পারে।

সুতরাং, ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, নিকটবর্তী দেশ সমূহের স্বার্থ প্রভৃতি বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের সাথে তাই জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত। জাতীয় নিরাপত্তার যৌক্তিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান তাই গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাব সমূহ ঃ

পার্বত্য উপজাতিরা চেয়েছিলেন স্বায়ত্বশাসন এবং বাঙালি রাষ্ট্র কাঠামোয় নিজস্ব জাতীয়তা ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার।[১৪] কিন্তু তাদের দাবি সমূহ প্রত্যাখ্যান হওয়ায় ১৯৭২ সালের ১৬ ই মে গঠন করা হয় 'পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতি'। ১৯৭২ সালে দেখা দেয় আরেক নতুন তরুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা প্রীতি কুমার চাকমা, যিনি আবার সক্রিয় করে তোলেন পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে। ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী খাগড়াছড়ির ইটছড়ির জঙ্গলে বিকশিত হয় শান্তিবাহিনী, পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান সরকারের সময়ে পর থেকে বাঙালি সেটেলারদের জান-মালের নিরাপত্তা ও সশস্ত্র বিপ্লব দমনে পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ও ভূমিকা বাড়তে থাকে। পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকেও পার্বত্য চট্রগ্রামের সেনাবাহিনীর ভূমিকার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। শান্তিচুক্তির পক্ষে বিপক্ষে উপজাতিরা দুটি ধারায় বিভক্ত এবং উভয় গ্রুপই সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে স্থানীয় রাজনৈতিক দল গুলোর দ্বন্দ্ব ,সংঘাত, চাঁদাবাজি, হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি কারণে সাম্প্রতিক সময়েও স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা যায়নি।

সুতারাং, বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে বহিশত্রুর প্রভাব ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে দেশের অপরাপর জেলার ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে গুটিমাত্র পুলিশ প্রশাসনই বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। পার্বত্য চট্রগ্রামে দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে ভিন্নতর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতির প্রয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এর প্রভাব ঃ

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় নিরাপত্তা একটি ব্যপক ও বহুল আলোচিত বিষয়। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয়। কেউ এটাকে সামরিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করাকে, আবার কেউ এটাকে অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে নিজ দেশের অর্থনীতিকে নিরাপদ রাখা মনে করে থাকতে পারেন। কেউ এটাকে কৌশলগত ভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া, আবার কেউ এটাকে সমান ভাবে সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাখা মনে করেন। কেউ এটাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা, আবার কেউ এটাকে ক্ষতিকর হুমকি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার নিশ্চিত করাকে বুঝিয়ে থাকেন। Harold Lasswell বিষয়টিকে বিবৃত করেছেন "The distinctive meaning of national security means freedom from foreign dictation".

জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি উন্নত ও অনুন্নত দেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় ভিন্ন। উন্নত দেশ তার জাতীয় নিরাপত্তা যতটা সহজে নিশ্চিত করতে পারে, ঠিক ততটা সহজ নয় অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের কাছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, " By security we mean the protection and preservation of the minimum core values of any nation: political independence and territorial integrity".

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা তার অভ্যন্তরীণ কিছু উপাদান যেমন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান, সীমান্তবর্তী দেশ সমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি বাংলাদেশের জাতীর নিরাপত্তা নীতি গ্রহণে বিবেচিত হয়ে এসেছে। নিম্নে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতির প্রয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এর প্রভাব আলোচিত হলো।

১৯৭১-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা:

স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সম্প্রদায় তাদের ৪ দফা দাবি শেখ মুজিবের নিকট পেশ করেন। মহান জাতীয় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তাদের সেই দাবি সমূহ উত্থাপন করে বারবার সরকারের দৃষ্টি আর্কষনের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তাদের দাবি সমূহ মেনে না নেয়া ও সংবিধানে তাদের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তাবনা না থাকায় পরবর্তীতে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৬ই মে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে এর সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী স্থাপিত হয়।[১৫] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যেসব অস্ত্র ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ফেলে রেখেছিল তা দ্বারা শান্তি বাহিনীকে অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়।[১৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের এরুপ সশস্ত্র বিপ্লব জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে সরকারের নীতি গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদানের কারণে ১৯৭৫ সালের পূর্বে ভারতকে আমাদের জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে মনে করা হতো না। ১৯৭৫ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ভারতের কোন পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। শান্তিবাহিনী গঠিত হলে শেখ মুজিব সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। শেখ মুজিব সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রে স্মারক নম্বর ২৫/১ ডি-১/৭২ তারিখ ২৭ জুন ১৯৭২ মোতাবেক, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে "অপারেশন অঞ্চল" হিসাবে ঘোষণা করেন।[১৭] জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের আমলেই এ অঞ্চলে অতিরিক্ত সংখ্যক সেনাবাহিনী সদস্য ও পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও রামগড়ের উত্তরে এবং বান্দরবনের দক্ষিণে বিমান হামলা করেছিল। শেখ মুজিবের আমলেই দীঘিনালা, আলী কদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া কাপ্তাইয়ে একটি নেভাল বেইস স্থাপিত হয়েছিল।[১৮] মূলত শেখ মুজিবরের আমল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি রাজনৈতিক বিবেচনার আস্থা হারাতে থাকে। তবে ১৯৭৫ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ভারতের সাহায্য সহযোগিতার চেষ্টা করলেও ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভারত তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি।[১৯]

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যু হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভৌগলিক রাজনীতির বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ায় চীন চায় অপরাপর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গুলোকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এ অঞ্চলে ভারতের বিরুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার রোধ করতে। ১৯৭৫ সালের পর প্রথমে খন্দকার মোস্তাক সরকার ও পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের সরকার চীনের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়। তারই ধারাবাহিকতায় চীন ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। অধ্যাপক মোঃ নুরুজ্জামান ৭৫ এর পরবর্তী নীতিকে "ঢাকা বেইজিং-ইসলামাবাদ" শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২০] ভারতের সাথে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করে বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের এই নিরাপত্তা নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর প্রভাব পড়েছিল। ভারত তার কৌশলগত নীতির কারণে জিয়াউর রহমানের সরকারের সময়ে শান্তি বাহিনীকে সহায়তা করা শুরু করল। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, Chittagong Hill Tarcts Commission Gi ঘোষণা থেকে-" It is widely known that the Indian goverment of Indira Gandhi gave active support ot Shanti Bahini insurgents allowing them to operate from bases in India .[২১]

এমনকি ভারত শান্তিবাহিনীকে কৌশলগত সাহায্যও প্রদান করেছিল। ভারত শান্তি বাহিনীকে নভেম্বর ৭৫, মার্চ ৭৭, আগস্ট ৭৯, এবং জুলাই ৮৯ এ বড় ধরণের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল। ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শান্তিবাহিনীর প্রথম ব্যাপক আক্রমনের খবর আসে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্য থেকে, যখন সেখানকার বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আক্রান্ত হয়। শান্তিবাহিনী রাস্তা মেরামতের কাজে নিয়োজিত সেনা প্রকৌশল বিভাগের সদস্যদের রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে হত্যা করে; নির্মাণ সামগ্রী ধ্বংস এবং অস্ত্র, গোলা বারুদ লুট করে নিয়ে যায়। জঙ্গল যুদ্ধে শান্তিবাহিনীর শক্তিমত্তা ও নৈপুণ্য প্রমাণ করে তাদের প্রথম হামলার ঘটনাটি।[২২] ১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র হামলা করেছিল একটি সামরিক কনভয়ের উপর। তাদের আক্রমনের ক্ষিপ্রতা ও তড়িৎগতিতা দেখে সামরিক বিশেষজ্ঞগণ এই আক্রমনকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। একই সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুরোধ করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য।[২৩]

শান্তিবাহিনীর হামলার প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয় সরকারি স্থাপনা, সামরিক বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের গ্রামগুলো। বিশেষ করে গভীর জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গিয়ে অকাতরে প্রাণ হারায় অনেক বিত্তহীন বাঙালি অভিবাসী। এমন প্রেক্ষাপটে শান্তিবাহিনীকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য জিয়াউর রহমান ওই এলাকায় প্রায় এক লাখ সৈন্য মোতায়েন করেন।[২৪] ১৯৭৫ সাল পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে শান্তি বাহিনীকে ভারত কর্তৃক সাহায্য ও অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুজিব হত্যাকান্ডের পর লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আশ্রয়ে চলে যান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকেন।[২৫]

এক দিকে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের উসকানী ও জনসংহতি সমিতিকে সহযোগিতা দান, শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা, সেটেলার বাঙালিদের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় জিয়াউর রহমানের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি সামরিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি বিবেচনায় জিয়াউর রহমানের সময় তাই সামরিক আধিপত্য ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্বত্য বিদ্রোহীদের সশস্ত্র হামলার বিপরীতে সেনাবাহিনী কাউন্টার ইনসারজেন্সি (Counter insurgency) বা সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের একচ্ছত্র প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ রোধ করতে তিনি পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক সমতলবাসী বাঙালিকে প্রতিস্থাপন করেন। যা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও বাঙালিদের মাঝে ভারসাম্য আনয়নের একটি প্রচেষ্টা। পার্বত্য বিদ্রোহে জিয়ার কঠোর নীতি একদিকে ছিল জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে; অন্যদিকে সেগুলো ছিল চরম অমানবিক।[২৬]

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা নীতি পরিবর্তিত হয়নি তবে হুবুহু তাঁর মডেল অনুসৃত হয়নি এরশাদ আমলে। এরশাদ শান্তি বাহিনীতে ভাঙন, উপদলীয়

Dhaka University Institutional Repository

কোন্দল, ভীতি ও ক্ষমার দ্বৈত চর্চা নীতি নিয়েছিলেন ।[২৭] তবে এরশাদ সরকারের আমলে পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় । তথাপি পার্বত্য বিদ্রোহীরা যখন সশস্ত্র লড়াই থেকে বিরত হয়নি । এরশাদের আমলে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার বা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি ।

খালেদা জিয়ার আমল থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী মোতায়েন রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটটির সমাধান সম্ভব নয়।[২৮] এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের স্থলে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিসহ সংশোধিত দাবিনামাটি উত্থাপন করেন। এদিকে বিশেষ করে নিরাপত্তাজনিত কারণে আবশ্যক সেনাবাহিনীর অবস্থান ব্যতীত সকল অস্থায়ী সেনা ছাউনি এক পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে বি, এন, পি সরকারের সম্মতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য ।[২৯]

পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্টত ভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমূহ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের উল্লেখ করেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করেন। জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহকে প্রধান করে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি। এরই ধারাবাহিক ইতিবাচক প্রচেষ্টার পর ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে সেনাবাহিনীর অবস্থান, অস্থায়ী সেনাছাউনী প্রত্যাহার, সেনাবাহনীর ব্যবহার প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্পষ্ট কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ ঃ

চুক্তির 'ঘ' অনুচ্ছেদের ১৭ (ক) ও ১৭ (খ) ধারায় সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এবং আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে নিয়োগের কথা বলা হয়। চুক্তিতে বিবরটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে-

(ক) সরকার ও জনসংগতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি,ডি,আর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যাক্ত জায়গা জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী পরিস্থিতি ও সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক ভূমিকা ঃ

জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশ্নবিদ্ধ এই কারণে যে দেশের অপরাপর স্থানের ন্যায় সেনাবাহিনীকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে। তাছাড়া কখনো 'অপারেশন দাবানল' বা 'অপারেশন উত্তোরণ' প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী তার ভূমিকাকে প্রশ্ন ও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে পারেনি। সেনাবাহিনী পূর্ববর্তী 'অপারেশন দাবানল' পরিবর্তন করে চুক্তির পরে 'অপারেশন উত্তোরণ' জারি করেছে। 'অপারেশন উত্তোরণে' কি আছে, সেটি সরকার ও প্রশাসনের কাছে বারবার জানতে চেয়েও সুস্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে এর আওতায় সেনা প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারন প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া সহ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এটিও এক ধরনের সেনাশাসন।[৩০]

শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি,ডি, আর বর্তমানে বি.জি.বি) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যাতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্রগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়ার যে কথাছিল তা অদ্যবধি বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনা ছাউনী প্রত্যাহারের কথা থাকলেও সরকার দুই শতাধিক সেনা ছাউনী প্রত্যাহারের কথা বললেও মাত্র ৩১ টি সেনা ছাউনী প্রত্যাহারের কাগজপত্র তাদের কাছে এসেছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তিচুক্তির এক যুগ পূর্তিতে ২০০৯ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রথম আলোর সাথে এক সাক্ষাৎকারে পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের মূল কাজে এখনো হাত দেয়নি। তিনি বলেন সরকার বিষয়টি কিভাবে দেখছে জানি না, কিন্তু বিগত ১২ বছরে পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রতিটি মানুষ অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তায় কাটিয়েছে।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দলীয় কোন্দল ও সশস্ত্র সংঘাত নিরসনে সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক ভূমিকা গুলোর কঠোর সমালোচনা করে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে সশস্ত্র সংঘাত তা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। সে হিসাবেই এটি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে হবে। আর যদি এটিকে আইন শৃঙ্খলার বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলেও তা নিয়ন্ত্রণে পুলিশি ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে পুলিশের কাজে। তাছাড়া পাহাড়ে ইনসার্জেন্সী (সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী তৎপরতা) না থাকলেও কাউন্টার ইনসার্জেন্সীর একটা চশমা এটে রাখা হয়েছে। দেশের অন্য কোন অঞ্চলে এ রকম সশস্ত্র সংঘাত হলে সরকার যা করত, এখানেও তাই করা উচিত।[৩২]

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী 'স্টাটেজিক ম্যানেজমেন্ট' ফোরাম গঠনসহ এমন কিছু কার্যক্রম নেয়া হয়েছে, যা চুক্তির সমান্তরাল একটি উদ্যোগ। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা বলেন, সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রস্তাব চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে নয়। বরং বিরোধ জিইয়ে রাখার একটি চেষ্টা।[৩৩] পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর রেখে সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সশস্ত্র বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর দ্বারা সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী তৎপরতা বিদ্রোহ প্রতিরোধ কার্যক্রম (Counter insurgency) জোরদার করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য 'স্টাটেজিক ম্যানেজমেন্ট' (Strategic management) ফোরাম গঠন করে তার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সব কার্যক্রম পরিচালনা করা সহ এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যা চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ব্যবহার উপজাতিদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার মতো মৌলিক অধিকারকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। আজও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক উপজাতি নেতাদের আটক ও তাদের উপর নজরদারি করা হয়। বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহার না করার দাবি চুক্তি লংঘণের শামিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল সমূহ অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে ব্যবহার করতে না পারায় উপজাতিরা তাদের স্বাভাবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের অধিকার থেকে বঞ্চিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সকল অস্থায়ী সেনানিবাস স্থানান্তর সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের কোন পরিবর্তন না হওয়ায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. Nuruzzaman, M. (1991). National Security of Bangladesh. *BIISS Journal, Vol - 12, No - 3*, 374-374

২. কামাল, ফিরোজ মাহবুব (১৯৯৭, এপ্রিল ৯)। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, *দৈনিক ইনকিলাব*।

৩. রব, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর (১৯৯১)। *বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি*। পৃ -১১৭-১১৮, ঢাকা : আদিবা প্রকাশনী।

৪. রব, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর (১৯৯৭)। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও রাজনীতি। *আহা পর্বত, আহা চট্টগ্রাম নামক স্মারক গ্রন্থ*। পৃ -১০৪-১০৪,

৫. রব, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর (১৯৯১)। পৃ -১১৭, op.cit.

৬. ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭, *সাপ্তাহিক রোববার*।

৭. ২৩ মে ১৯৯৭, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*।

৮. ৪ জুন ২০০১, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৯. পূর্বোক্ত

১০. Chowdhury, N. (1989). Sino-India Guestfor Rapprochment Implication for South Asia. *BIISS Journal, Paper No - 9*,

১১. Chowdhury, N. (1989). op.cit.

১২. রহমান, মোঃ সাইদুর (২০০৩)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহ বহিঃ শক্তির ভূমিকা*, এম ফিল গবেষণা, অভিসন্দর্ভ। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. Talukder, M. (1982). The Future of Bangladesh. In Wilson. J and Datton. D (Ed.), In *The states of South Asia, Problem of National Integration ed.*, (p. 270). New Delhi.

১৪. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*। পৃ -৩৯-৩৯, ঢাকা : সন্দেশ।

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. Mohsin, A. (1996). Military Hegemony and The CHT. *Journal of Social Studies*, *No -72*, 3-3

১৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের রহস্য (১৯৯৭, মে ১০)। *দৈনিক দিনকাল*।

১৮. Mohsin, A. (1996). op.cit.

১৯. Mohsin, A. (1996). op.cit.

২০. Nuruzzaman, M. (1991). op.cit.

Dhaka University Institutional Repository

২১. Life is not ours. (1991). *CHT Commission Bulletin*, 16-16.

২২. Ali, S. (1996). *The Hitch in the Hills*. Chittagong: Dil Monowara Begum.

২৩. Mohsin, A. (1996). op.cit.

২৪. আমিন, মোঃ নুরুল (১৯৯২)। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫. Mohsin, A. (1997). *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts*, Dhaka : UPL.

২৬. পারভেজ, মাহফুজ (১৯৯৯)। পৃ ৫৫, op.cit.

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত পৃ ৬০,

২৯. রশিদ, হারুন-অর (১৯৮৯, জুলাই ১৭-২০)। জাতীয় সংহতির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ। *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

৩০. ৪ জুন ২০০৯, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৩১. ২ ডিসেম্বর ২০০৯, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৩২. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৩৩. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি শরণার্থী সমস্যা একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি পাহাড়ীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের ভিটে বাড়ী ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। কখনো তাদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা হয়েছে। কখনো বা জীবন ও নিরাপত্তার জন্য স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে দুই ধরণের উদ্বাস্তু দেখা যায় : অভ্যন্তরীণ (দেশের মধ্যে স্থানান্তরিত) ও বাহ্যিক (দেশান্তরিত)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধিবাসীরা মূলত তিন পর্যায়ে উদ্বাস্তু হয়েছিল। যথাঃ

১. ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সময় উদ্বাস্তু (দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু)।

২. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সীমান্ত থেকে গুলিবর্ষণের ফলে উদ্বাস্তু ও পরবর্তী সময়ে মিজো বিদ্রোহী দমনের নামে ব্যাপক অভিযানের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু (দেশান্তরিত / প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ)।

৩. ১৯৭৫ সাল থেকে আন্দোলন দমনের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু (দেশান্তরিত / প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ)।[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের শরণার্থী পুনর্বাসন প্রেক্ষাপট ঃ

ষাটের দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য সমতল ও চাষযোগ্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। ফলে চট্টগ্রামের ১২৫টি মৌজার ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য সর্বোত্তম কৃষিজমি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়। ফলে এই চাষযোগ্য সমতলভূমির উপর জীবিকা নির্ভরকারী ১৮ হাজার পরিবারের প্রায় ১ লক্ষ উপজাতি যাদের অধিকাংশই চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত, বাস্তুভিটাচ্যুত হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বাস্তুভিটাচ্যুত উপজাতিদের যথাযথ পুনর্বাসন করা হয়নি। নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে এবং পরিবেশগত কারণে বাস্তুভিটাচ্যুত হয়ে ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার চাকমা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক পাহাড়ী মায়ানমারে চলে যায়। ভারত সরকার শরণার্থী চাকমাদের অরুণাচল রাজ্যে বসতি স্থাপন করার সুযোগ দেয়।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে কেন বারবার সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তার পিছনে বিবিধ কারণ নিহিত। তার মধ্যে ভূমির দখল ও ভূমি থেকে বাস্তুহারা অন্যতম একটি কারণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির মালিকানা নিয়ে উপজাতিদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে ১৯৭৯ সাল থেকে যখন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন ও পুনবার্সন করা হয়। অবশ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো স্বীকার

Dhaka University Institutional Repository

না করলেও সরকারী উদ্যোগে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয় বাঙালিদের অভিবাসন এবং পুনর্বাসন করা হয়েছিল তা প্রশাসনিক বিবিধ দাপ্তরিক আদেশে প্রমাণ পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে সম্বোধনকৃত চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের ৪টা এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখের ৬৬ (৯)/সি এবং দেশের অন্যান্য জেলার জেলা প্রশাসকদের সম্বোধনকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখের ১০২৫ নম্বর স্মারক দুটির বিষয়বস্তু এবং পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে অ-উপজাতীয় অভিবাসন ও পুনর্বাসনের সত্যতাকে প্রমাণিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবিন্যাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেও সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য এলাকায় অ-উপজাতীয় অভিবাসন ও পুনর্বাসনের সত্যতা প্রমাণিত হবে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জনসংখ্যার বিবরণ নিম্নের টেবিলে দেওয়া গেল ঃ [৩]

বৎসর	উপজাতীয় (%)	অ-উপজাতীয় (%)
১৯০১	৯৩	৭
১৯৫১	৯১	৯
১৯৬১	৮৮	১২
১৯৭৪	৭৩	২৭
১৯৮১	৫৯	৪১
১৯৯১	৫১	৪৯

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায়, ১৯৭৪-১৯৮১ এই ৭ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ২১% যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসে সর্বাধিক। ১৯০১ সালের পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ১৯৮১ সালে উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় জনসংখ্যার সংখ্যানুপাত অ-উপজাতীয়দের অনুকূলে, হঠাৎ ৭৩ ঃ ২৭ থেকে ৫৯ ঃ ৪১ তে উন্নীত হয়। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যার এ অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটানো হয়েছিল। এ অস্বাভাবিক উপায়টি ছিল এই সময়ে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য এলাকায় অ-উপজাতীয়দের অভিবাসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে সেখানে অ-উপজাতীয়দের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রাধান্য কায়েম করা ছিল এর উদ্দেশ্যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অ-উপজাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলনকে দমন করতে সুবিধা হবে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অভিবাসনের ফলে প্রধান যে সমস্যাটি ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে তা হলো ভূমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের এরুপ অভিবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতিদের অভিবাসনের ফলে ভূমির উপর তাদের চিরায়িত অধিকার সংকুচিত হতে থাকে। স্থানীয় উপজাতীয়রা তাদের অনেক দিনের ভোগ দখলকৃত জমি গুলো কখনো বল প্রয়োগে, কখনো প্রতারণার মাধ্যমে অ-উপজাতীয় বাঙালিরা দখল করতে থাকে। এভাবে তাদের পূর্ব পুরুষের ভূমি হারিয়ে উপজাতীরা অন্যত্র, লোকালয়ের বাইরে জঙ্গলে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে এক প্রশাসনিক আদেশবলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অভিবাসন বন্ধ করা হলেও তার সুদূর প্রসারী প্রভাব থেকে যায়। তারপরও এই অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। কখনো আত্মীয় স্বজনের হাত ধরে বা স্ব-উদ্যোগে অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের জন্য অ-উপজাতীয় বাঙালিরা স্থানান্তরিত হতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় শরণার্থীদের পাশ্ববর্তী ভারত ও মায়ানমারে প্রবেশের ফলেও তাদের জীবনে মানবিক অধিকারগুলো ছিল অনুপস্থিত। সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত বা মায়ানমারে তাদের শরণার্থী জীবন ছিল দুর্বিষহ। শরণার্থী জীবন কারো কাম্য নয়। অনেকদিন ধরে আশ্রিত থাকলেও তাদের জীবন অস্থায়ী যাযাবর জাতির মতো। শরণার্থী জীবনের দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা এবং হতাশা শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের জীবনে শরণার্থী হওয়ায় এই অভিজ্ঞতা আছে। গ্রীক লেখক Euripides প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বৎসর আগে শরণার্থীদের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন "There is no greats sorrow on earth than the loss of one's natives land". উপজাতীয় শরণার্থীদের আশ্রয় শিবির গুলোতে উপজাতিদের মানবেতর জীবন-যাপনও তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করছিল। ষাটের দশকে ভারতের অরুনাচলে আশ্রয় নেয়া বসতি স্থাপনকারী চাকমারা আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির দাবিতে সেখানে আন্দোলন করেছিল। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে চাকমাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন মেনে নিতে নির্দেশ দিলেও রাজ্য সরকার তা মানেনি। এ দিকে ভারতীয় সংসদীয় পিটিশন কমিটি অরুনাচল প্রদেশে বসবাসকারী চাকমা ও হাজংদের তফসিলী উপজাতির মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেয়ার সুপারিশ করে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সাথে সাথে অরুনাচলের স্থানীয় অধিবাসীরা আশ্রিত চাকমাদের প্রতি ধীরে ধীরে বৈরী হয়ে উঠে এবং চাকমাদের অরুনাচল হতে বিতাড়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে।

অপরদিকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে স্থাপিত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীরাও কোন ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের দুঃসহ মানবেতর জীবন-যাপনের সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যু, ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা, অসন্তোষ, অশিক্ষা শরণার্থী জীবনের দৈনন্দিন সাথী। গায়ে গায়ে লাগা ছোট ছোট খুপরিতে গাদাগাদি করে বাস করতে হয়েছিল শরণার্থী

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার গুলোকে। সেখানকার নরকীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল ক্যাম্পে জন্ম নেওয়া শিশুরা। তাদের অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বয়স্কজনেরা ছিলেন চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।[৫]

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয় ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম বিষয়াবলীর মধ্যে উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসন, ক্ষমা প্রদর্শন ও শান্তি বাহিনীর উপজাতীয় সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বিষয়ে সরকারের সাথে একটি লিখিত চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন, ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী আজও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার কিছু অংশ আংশিক বাস্তবায়ন হলেও অনেক ধারা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির "ঘ" অনুচ্ছেদে শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য ও বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণীত অবস্থানে পৌছাইয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেনঃ

১. ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ, ১৯৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ, ১৯৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২. সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য অঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু ও যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকরতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩. সরকার ভূমি বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকার জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভ ল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যে সব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করণের পূর্ণক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না। এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীজ ল্যান্ড (জলে ভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫. যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি শরণার্থী পুনর্বাসন বর্তমান অবস্থা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এক যুগ অতিবাহিত হলেও উপজাতি শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে বিভিন্ন ধারার আংশিক বাস্তবায়ন ও কিছু বিষয়ে প্রায় অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে।

অভ্যন্তরীণ উপজাতি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১ ও ২ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহের অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে একটি টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র উপজাতীয় উদ্বাস্তু কথাটি না থাকলেও পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরকেও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর বিরোধিতা করে। পরবর্তীতে টাস্কফোর্সের নবম সভা চলাকালে বাঙালি সেটেলারদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে চিহ্নিত করার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় টাস্কফোর্সের নবম সভা চলাকালে ওয়াক আউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে ১৫ মে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের অবৈধ একাদশ সভায় একতরফা ভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অ-উপজাতীয় বাঙালি পরিবারকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ মে ২০০০ ইং তারিখের টাস্কফোর্স এর অবৈধ একাদশ সভায় একতরফাভাবে পরিচিহ্নিত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা নিরুপ।[৬]

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অ-উপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	১৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবন	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮২৩৫	১,২৮,৩৬৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ মনে করেন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে অ-উপজাতীয় বাঙালিদের অর্ন্তভূক্ত করার মাধ্যমে অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসিত করা চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাদের মতে, অ-উপজাতীয় বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করায় পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে অ-উপজাতীয় বাঙালিদের অর্ন্তভূক্ত করাকে শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। টাস্ক ফোর্স পুর্ণগঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।[৭] পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সকরারের সময়ও অভ্যন্তরীণ শরণার্থী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নে সরকারের আগ্রহ ও সদিচ্ছার যে আশা করা হয়েছিল আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৩ মার্চ ২০০৯ খাগড়াছড়ি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে টাস্কফোর্সের পুর্ণগঠিত হয়। টাস্কফোর্স পুর্ণগঠনের পর গত ৫ অক্টোবর ২০০৯ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে টাস্কফোর্স এর সভা অনুষ্টিত হয়। উক্ত সভায় মূলত পরবর্তী সভার আলোচ্য সূচী নির্ধারণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিত করণের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানকল্পে গত ২৭ই জানুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত সভায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ ও প্রকৃত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের অর্ন্তভূক্ত করা, ২০ দফা প্যাকেজ

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা, টাস্কফোর্সের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত করা, টাস্কফোর্সের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং জনবল ও তহবিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক সেটেলার বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা ও টাস্কফোর্সের সদস্য এর বিরোধিতা করে।[৮] আপাত অনুসন্ধানে দেখা যায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বাঙালিদের অর্ন্তভূক্তির বিরোধিতার কারণেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুর্ণবাসন প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তির পর ভারত প্রত্যাগত উপজাতি শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এই মর্মে দীপংকর তালুকদারের নেতৃত্বে গঠিত টাস্ক ফোর্স ৭/৫/২০০০ তারিখে সরকারের নিকট ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের অগ্রগতি ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "ইতোমধ্যে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ দফা প্যাকেজের অধিকাংশ দফার ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে"। কিন্তু শরণার্থীরা এ বিষয়ে বলেন ভিন্ন কথা। তারা বলেন, প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি বিষয়ক জটিলতা দূর করা হয়নি, তাদের জমি অ-উপজাতীয়রা এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বলপূর্বক দখল করে রেখেছে, শরণার্থীদের ঋণ মওকুফ করা হয়নি, ভূমিহীন শরণার্থী পরিবার গুলোকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। তাছাড়া সকল চাকুরীজীবি শরণার্থীকে স্ব,স্ব পদে বহাল করা হয়নি; যাদের বহাল করা হয়েছে তাদের চাকুরীতে জৌষ্ঠতা সহ প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়নি। তবে প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, জমি বিষয়ক জটিলতা ও চাকুরীজীবি শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহালের পর তাদের চাকুরীতে জৌষ্ঠতাসহ আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্র ছাড়া শরণার্থীদের ২০ দফা প্যাকেজভূক্ত অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

সরকার শরণার্থীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজভুক্ত ২০ দফা সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। ১২,২২২টি শরণার্থী পরিবারকে পরিবার প্রতি ১৫,০০০/-টাকা করে মোট ১৮,২৬,৯০,০০০/-টাকা প্রদান;

২। চাষযোগ্য জমি আছে এমন ৭০৮টি পরিবারকে পরিবার পিছু হালের বলদ ক্রয় বাবদ ৮,০০০/-টাকা হিসাবে মোট ৫৭,৪৪,০০০/-টাকা এবং ৬,৭২৬টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ১০০০০/-টাকা করে মোট ৬,৭২,৬০,০০০/-টাকা প্রদান।

৩। ভূমিহীন ৫২৪৮ টি পরিবারকে গাভী ক্রয়ের জন্য পরিবার প্রতি ৩,০০০/-টাকা করে মোট ১,৫৬,৬৩,০০০/- টাকা প্রদান;

৪। ১০৪২৭টি পরিবারকে কাঠক্রয় বাবদ পরিবার প্রতি ৩০০০/-টাকা করে মোট ৩,১২,৬৯,০০০/-টাকা প্রদান;

Dhaka University Institutional Repository

৫। ১২,২২২টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ বান্ডিল করে মোট ২৪,৪৪৪ বান্ডিল টিন প্রদান যার আনুমানিক মূল্য ১০,০০,০০,০০০/-টাকা;

৬। মৃত ১০০ জন শরণার্থীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য জনপ্রতি ১০,০০০/-টাকা করে মোট ১০,০০,০০০/-টাকা প্রদান;

৭। ৭০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের জন্য ৭,০০,০০০/-টাকা প্রদান;

৮। ১০,৮৯৫টি পরিবারকে নিজ জমিতে, ৫৩৩টি পরিবারকে খাস জমিতে, ৭৪৬টি পরিবারকে আত্মীয়-স্বজনের জমিতে পুনর্বাসন করা হয়; ১ জন শরণার্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন বলে তাকে তার জমিতে পুনর্বাসিত করা হয়নি;

৯। ১৯৩ জন শরণার্থীকে পুলিশ বাহিনীতে দেওয়া হয় এবং

১০।১২৮ জন শরণার্থীকে তাদের পূর্বের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।[৯]

চুক্তি অনুযায়ী শরণার্থী পুনর্বাসনের যে দুটি বিষয় এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত বা আংশিক বাস্তাবায়িত হয়নি তার অন্যতম হলো :

প্রথমত, শরণার্থীদের জমি-জমার মালিকানা ফেরত ও ভোগ দখল সম্পর্কিত বিষয়।

দ্বিতীয়ত, চাকুরীজীবি শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহালের পর তাদের চাকুরীতে জোষ্ঠতা, পদোন্নতি, পেনশন প্রভৃতি আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি।

উপজাতি শরণার্থী ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান প্রসঙ্গ ঃ

ভারত প্রত্যাগত উপজাতি শরণার্থীদের তাদের জমি জমা ফেরত ও নিজ ভিটায় পুনর্বাসিত করাটা ছিল সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের প্যাকেজ সুবিধার আওতায় অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুবিধাদি বাস্তবায়িত করতে পারলেও নিজ ভিটে বাড়ী ও জমি জমা ফেরত প্রদান করাটা প্রায় অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। শরণার্থীদের জমিজমা মালিকানা ও ভোগদখল সম্পর্কিত পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের ৩ ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রথমত, কোন কোন উপজাতি শরণার্থী দেশ ত্যাগ করে ভারতে যাওয়ার পূর্বে বাঙালিদের নিকট স্থানীয়ভাবে কাঁচা দলিল মূলে জমি বিক্রয় করেছিল। কিন্তু শরণার্থী জমি বিক্রেতা দেশে প্রত্যাবর্তন করে কাঁচা দলিল মূলে জমি বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার জন্য দাবি করে। কাঁচা দলিল মূলে জমি ক্রয় করে বাঙালি ক্রেতা ঐ জমির ভোগ দখল করছিল। ৩টি পার্বত্য জেলার ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বিষয়টি দেশের অন্যান্য জেলার মতো অবাধ নয়। এজন্য পার্বত্য জেলা পরিষদের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে যে, পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

জেলা পরিষদ থেকে অনেক সময় এই ছাড়পত্র পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও এজন্য সময়ক্ষেপন করা হয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, ৩টি পার্বত্য জেলায় কাঁচা দলিল মূলে জমি ক্রয় বিক্রয় অতি সাধারণ ঘটনা।[৮] এই সুযোগে অনেক বাঙালি উপজাতী শরণার্থীদের জমি-জমা, ভিটেমাটি ভূয়া কাঁচা দলিল মূলে প্রতারণার মাধ্যমে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে জবর দখল ও ভোগ করে আসছে। এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অ-উপজাতীয়দের দ্বারা ভোগকৃত জমি জমা শরণার্থীদের ফেরত দিয়ে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ উপজাতীয় শরণার্থীরা যারা তাদের দীর্ঘদিনের চাষাবাদের জমি পানিতে নিমজ্জিত হলে প্রতিবেশী দেশ ভারতে শরণার্থী হয়, পরবর্তীতে এই সব শরণার্থীরা দেশে ফিরে এলে তাদের জন্য অধিগ্রহণ করা জমিতে পুণরায় পুনর্বাসিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার উদ্ভব হয়। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যেসব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, সেসব জমি ও জলে ভাসা জমি বন্দোবস্তের ভিত্তিতে জমির প্রাক্তন মালিকেরা ভোগ দখল করে আসছিল। এরূপ পাহাড়ী যারা সীমান্ত অতিক্রম করে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের পক্ষে উক্ত জমির বন্দোবস্ত যথাসময়ে নবায়ন করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন বাঙালিদের প্ররোচনায় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ঐসব জমি খাস জমি হিসেবে বাঙালিদের নিকট বন্দোবস্ত দিয়েছিল। পরবর্তীতে অনুকূল পরিবেশে উপজাতি শরণার্থীরা দেশে ফিরে স্বাভাবিকভাবেই ঐ জমি তাদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের এবং জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানায়। স্থানীয় প্রশাসনের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের জন্যই এই অনাকাঙ্খিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

তৃতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন অনেকটা পক্ষপাতমূলক ও অযৌক্তিকভাবে উপজাতীয়দের মালিকানাধীন পরিত্যাক্ত জমি বাঙালিদের নিকট ইজারা প্রদান করে। ব্যক্তি পর্যায়ের এসব জমি কিভাবে সরকারের স্থানীয় প্রশাসন বাঙালিদের ইজারা প্রদান করেছিল তা যেমন অনুসন্ধান করা হয়নি ঠিক তেমনি তা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের কর্তৃত্ব বহির্ভূত ও অনৈতিক। স্থানীয় প্রশাসনের এরূপ মালিকানাধীন উপজাতীয়দের পরিত্যাক্ত জমি বাঙালিদের মাঝে ইজারা দেওয়ার ফলে উপজাতি শরণার্থীরা ফেরত এলে তাদের জমি জমা ফেরত প্রদান করে পুনর্বাসিত করতে সরকারকে বিব্রতকর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের জুম্ম শরণার্থীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত হয়ে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করেন। উপজাতি শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাদী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জমি ও ভিটে মাটি ফেরত দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা-জমি ও গ্রাম এখনো বাঙালি সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্মু শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয় সমুহ নিরুপ ঃ [১০]

মোট প্রত্যাগত জুম্মু শরণার্থী সংখ্যা ৬৪,৬০৯ জন	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি	৯,৭৮০ পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয় নি	৬ টি বিদ্যালয়
স্থানান্তরিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে।	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০ টি
ঋন মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জন, মতান্তরে ১২০০ জনের অধিক

পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তিতে শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়টি বর্তমানে স্থবির হয়ে রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী শরণার্থীদের অর্থনৈতিক সুবিধাবলী প্রদান করা হলেও ভূমির অধিকার ও ভূমি প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হয়নি। উপরোন্ত এখনও সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূমি জবরদখল ও ইজারা প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভূমি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমির দখল অব্যাহত রয়েছে।

উপরোন্ত ইতিপূর্বে চারদলীয় সরকারের সময় (২০০১-২০০৫) ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের রেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত উপজাতি শরণার্থীদের আতংকিত কেরে তোলে। জেনারেল জিয়ার আমলে যে ৪ লাখ বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেয়া হয় তাদের মধ্যে যারা এখনও গুচ্ছগ্রামে বাস করছে তাদের জন্য প্রায় ২০ বছর যাবত প্রতিমাসে রেশন দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভারত হতে আসা শরণার্থীদের মধ্যে ৩ হাজার ৩৫টি পরিবার এখনও তাদের ভিটেমাটিতে যেতে পারেনি। কারণ সেটেলার বাঙালিরা কেবল তাদের ভিটেমাটি দখল করেনি, তাদের জায়গা জমিনও দখল করে রেখেছে। সেটেলারদের রেশন বরাদ্দ বহাল রেখে উপজাতি শরণার্থীদের রেশন বরাদ্দ বাতিল করা হলে সেটা উপজাতিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান প্রসঙ্গে এই খন্ডের ৩ নং ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু'একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু'একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

উপজাতি শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রসঙ্গ :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপজাতীয় শরণার্থীদের অর্থনৈতিক বিষয়াদি প্রায়শই বাস্তবায়িত হলেও যে বিষয় গুলো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে তার মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল ও চাকুরীতে তাদের জোষ্ঠতা প্রদান সহ অন্যান্য সুযোগ সবিধা নির্ধারণ ও পেনশন নির্ধারণ করতে গিয়ে শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্সকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান অনুসরণে তাদের অনেককেই চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য কোন কোন চাকুরীজীবি শরণার্থী কর্মস্থলে ৫ বছর বা তদূর্ধকাল যাবত অনুপস্থিত ছিলেন, কেউ কেউ আদালত কর্তৃক বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ আবার শরণার্থী হিসাবে ভারতে অবস্থানকালেই সরকারী চাকুরীর নির্ধারিত বয়স পার করেছিলেন। এদের চাকুরীতে পুনর্বহাল ও জোষ্ঠতা প্রদান, আর্থিক সুবিধা এবং তাদের পেনশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিধি, প্রবিধি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদের পাওনা পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধি শিথিল করার প্রয়োজন ছিল যা করা হয়নি। শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধা নিরুপনের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করা হয়নি। পরামর্শ করা হলে চাকুরি সংক্রান্ত সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব হতো না।[১২]

শান্তিচুক্তি অনুযায়ী, শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনবার্সিত করতে হবে। শান্তিচুক্তির পর ভারত হতে ৬৫ হাজারেরও অধিক উপজাতি বাংলাদেশে ফেরত আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও ৩০৩৫টি পরিবার তাদের নিজ নিজ ভিটেমাটিতে ফেরত যেতে পারেনি এবং জমি-জমাও ফেরত পায়নি। তাছাড়া অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু ৫০ হাজারের অধিক উপজাতি তাদের ভিটেমাটিতে ফেরত যেতে পারেনি। কারণ শান্তিচুক্তির সকল শর্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি।[১৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপজাতিদের নিজ বাসভূমে পুনর্বাসিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি প্রতিকূল বৈরী পরিবেশে উপজাতিরা তাদের আবাসস্থল ছেড়ে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছিল। শান্তিচুক্তির পর উপজাতিরা আশ্বস্থ হয়েছিল তারা ফিরে এসে তাদের দখল হওয়া জমি-জমা এবং জীবন ও জীবিকার

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাশা পূর হয়নি। উপজাতি শরণার্থীরা আজও অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন জীবন-যাপন করে যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাবে উপজাতি শরণার্থীরা অঞ্চলিক পরিষদ থেকেও কোন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। সরকার ঘোষিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার আওতায় শরণার্থীরা কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য পেলেও তা শরণার্থীদের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতেও ব্যর্থ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি অবস্থা শরণার্থীদের মাঝে হতাশা, ক্ষোভ ও বঞ্চণার জন্ম দিচ্ছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি নিশ্চিত করতে হলে উপজাতি শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসিত করে তাদের স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. খীসা, সুধাসিন্ধু (২০০৫) । পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু সমস্যা, Hill Tracts Forum : রাঙামাটি ।

২. আলী, মোহাম্মদ জুলফিকার (২০০৯) । *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শরনার্থী* । পৃ -৩৯, ঢাকা : মৌসুমী প্রিন্টার্স ।

৩. পূর্বোক্ত পৃ-৪৫ ।

৪. পূর্বোক্ত পৃ-৪৬ ।

৫. পূর্বোক্ত পৃ-৬০ ।

৬. পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ক্রোড়পত্র (২০১০, ডিসেম্বর ২) । পৃ-৪৩, তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতি : রাঙামাটি ।

৭. পূর্বোক্ত পৃ-৪৪ ।

৮. পূর্বোক্ত ।

৯. আলী, মোহাম্মদ জুলফিকার (২০০৯) । পৃ -১২৯, op.cit.

১০. পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ক্রোড়পত্র (২০১০, ডিসেম্বর ২) । পৃ-৪২, op.cit.

১১. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪) । *জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়* । পৃ- ৯৯, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী ।

১২. আলী, মোহাম্মদ জুলফিকার (২০০৯) । পৃ -১৩১, opcit.

১৩. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪) । পৃ- ৯৯, op.cit.

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ ঃ লংঘন ও প্রতিবন্ধকতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতার যে বিকেন্দ্রীকরণ তা আমরা শুধু কাগজে কলমেই দেখতে পাই। অর্থাৎ ক্ষমতায়নের অভাবে আঞ্চলিক পরিষদ বাস্তবে কার্যত অচল। আর চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়ার পিছনে চুক্তির লংঘন ও প্রতিবন্ধকতা সমূহ প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। গবেষণার স্বার্থে সাহিত্য পর্যালোচনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঠকর্ম পর্যায়ে সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর করতে যে সকল লংঘন ও বাঁধা সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ

শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পুরোধা হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদকে ঘিরে পার্বত্য অধিবাসীদের মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, শান্তিচুক্তির ১৬ বছরেও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে পুরো আঞ্চলিক পরিষদ অকার্যকর রয়ে গেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পর এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলি সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, Hill District Council, স্থানীয় সরকার পরিষদ (পৌরসভা, ইউনিয়ন), সামরিক কর্তৃত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে পরিচালিত করছে। অথচ সরকার চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদের কাছে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব যথেষ্টভাবে বন্টন করছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তাদের কার্যাবলি কিভাবে সমন্বয় করবে, প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা ও স্তরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে কিভাবে প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদ কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারছে না। সরকার আজ অবধি আঞ্চলিক পরিষদের জন্য আলাদা কোন নিয়ম নীতি ও অবকাঠামো প্রণয়ন করেনি। ফলশ্রুতিতে, স্পষ্ট নির্দেশনা ও অবকাঠামোগত দূর্বলতায় আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করতে পারছে না। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, লোকবল, অর্থ ও অবকাঠামোগত দূর্বলতায় স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক পরিষদ অনেকটাই অকার্যকর।

তাছাড়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রণালয়কে অধিকতর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দিয়ে মূলতঃ আঞ্চলিক পরিষদকে দুর্বল ও অকার্যকর করে রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শই আঞ্চলিক পরিষদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে বিবেচনা না করে পরিষদের বাজেট তৈরী করে। স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রগতি ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেগুলো প্রায়শই পাশ কাটিয়ে গেছে। স্পষ্ট ও লিখিত নিয়মের অভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি ও তত্ত্বাবধানের প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদ মূলতঃ দ্বিধা বিভক্ত ও পরস্পরের প্রতিযোগি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে উন্নয়ন তদারকি ও তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ অকার্যকর।

আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায়নের দাবি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সব সরকারের আমলেই পাশ কাটিয়ে গেছে। পূর্বের ও বর্তমান সময়ের সকল সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর ও আঞ্চলিক পরিষদকে শক্তিশালী করতে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের জবাবদিহিতা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের নিকট। অপরদিকে স্থানীয় সরকার পরিষদের জবাবদিহিতা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে। তাছাড়া নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত।[১] তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় বাজেট তৈরীর ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকলেও পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে বাজেট তৈরী করে তখন তা পার্বত্য উপজাতিদের প্রয়োজনকে অবহেলিত করে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের পৌরসভা সহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ক্ষমতা দেয়া হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আইনের অধীনে থানা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম সরকার সহ সকল স্থানীয় সরকার সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বৈত প্রশাসনের ভূমিকায় স্থানীয় কাঠামো গুলোর মাঝে সংশয় বিরাজ করছে।

469998

মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটিতে পরিষদের চেয়ারম্যান ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার সাংসদ, চাকমা রাজা, মং রাজা, বোমাং রাজা, তিন জেলা থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন অ-উপজাতি প্রতিনিধির উপস্থিতির কারণে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতে আঞ্চলিক পরিষদের একক গুরুত্ব ও প্রাধান্য দূর্বল হয়েছে। এভাবে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সুকৌশলে আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে চিরায়িত স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও স্থানীয় উন্নয়ন কার্যাবলী সম্পাদন করছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই দ্বৈত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণে আঞ্চলিক পরিষদের কাছ থেকে কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের অংশগ্রহণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় কাঠামোর অভাব ঃ

শান্তিচুক্তি একটি নিয়মতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় অবকাঠামো গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক চর্চার যে আশা ও সম্ভাবনা ছিল বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়নি। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ জন নির্বাচিত হবেন যা পরবর্তীতে আঞ্চলিক পরিষদকে নির্বাচিত করবেন। কিন্তু আজ অবধি পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্যবাসী তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থেকেই শুধু বঞ্চিত হয়নি বরং ইতিপূর্বে চারদলীয় জোট সরকারের সময় (২০০১-২০০৫) চুক্তির চূড়ান্ত লংঘন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, একজন পাহাড়ীর উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা। অথচ সেই সময় খাগড়াছড়ি জেলার সংসদ সদস্য বহিরাগত আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তারপর বিএনপি দলীয় লোককে তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিএনপি দলীয় লোক হওয়ায় তারা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক আহূত মাসিক সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সমন্বয় করার কথা। এভাবে পার্বত্য উপজাতিরা তাদের পছন্দসই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত।[২]

পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক ভোটার তালিকা আজও প্রণীত হয়নি। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা প্রথম আলোকে এক সাক্ষাতকারে বলেন,[৩] পার্বত্য চুক্তির অনেক আগেই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক নির্বাচন না করেই দলীয় নেতা কর্মীদের পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে বছরের পর বছর ধরে অন্তবর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করছে। বস্তুত অন্তবর্তীকালীন এসব পরিষদের জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। তিনি মনে করেন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও পরিষদ সদস্যদের নির্বাচিত করা হলে জেলা পরিষদ সমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পরোক্ষভাবে স্থানীয় প্রশাসনে পার্বত্যবাসীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে। তাই পার্বত্য নির্বাচন বিধিমালা এবং পার্বত্য স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরী।

বিগত সরকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অসম্মতি সত্ত্বেও সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান বস্তুত সরকারের একজন এজেন্ট হিসাবে সরকারের লক্ষ্য গুলিই বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয়। উদাহারণস্বরূপ শরদিন্দু শেখর চাকমা বিগত চারদলীয় সরকারের সময়

Dhaka University Institutional Repository

(২০০১-২০০৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে চা বাগান করার ঘোষণায় সরকার মনোনীত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের ভূমিকা বিবৃত করেছেন এভাবে, "যে তিনজন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরকারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন তারা কেউ জনগণের প্রতিনিধি নন। তারা কোনদিন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হননি। রাজনীতির কূটচালে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এখন তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য সরকারকে খুশি করার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন"। [৪]

সাক্ষাতকার গ্রহণকালে ললিত কুমার চাকমার মতে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি জেলা পরিষদে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো নিশ্চিত করা হতো তাহলে পক্ষান্তরে আঞ্চলিক পরিষদ শক্তিশালী হতো। কিন্তু সরকার মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা জেলা পরিষদ গুলো পরিচালনার মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা সরকার মনোনীত ব্যক্তিরা কখনই আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে না, তারা বরং সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নেই বেশী আগ্রহী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাক্ষাতকার গ্রহণে আরও ৯ জন ঠিক অনুরূপ মতামত পোষণ করেন।

সরকার মনোনীত এই অবকাঠামো স্থানীয় জনগণের আস্থা ও অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে তাতে জনগণের অংশগ্রহণকে পক্ষান্তরে সংকুচিত করা হয়। আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উল্লেখিত পার্বত্য জেলা পরিষদ হয় সরকার না হয় পার্বত্য জেলা জনসংহতি সমিতি দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও পার্বত্য এলাকায় গণতান্ত্রিক চর্চা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নের চর্চা জনপ্রতিনিধিদের হাতে না থাকায়, সরকার পাহাড়ীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ। এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে পার্বত্য উপজাতিদের নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পার্বত্য জনগণের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। পাহাড়ীদের পছন্দসই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অভাব পাহাড়ীদের ক্ষমতায়নের অধিকারকে খর্ব করে যা পক্ষান্তরে পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

স্থানীয় দলগত দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র সংঘাত ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে দৃশ্যত তিনটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সক্রিয়। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় জনসংহতি সমিতি। অন্য দুটি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (UPDF) ও নবগঠিত জেএসএস (বিক্ষুব্ধ)। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন দলের নামে আরও বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী সক্রিয়। মূলত শান্তিচুক্তি বিষয়েও এদের রয়েছে দ্বিমত। জনসংহতি সমিতি চুক্তি সম্পাদন করলেও ইউপিডিএফ প্রথম থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। বর্তমানে স্থানীয় দল গুলোর মতানৈক্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থকদের মাঝে পক্ষ-বিপক্ষ মতভেদ প্রতিষ্ঠা করছে। এমতাবস্থায়, সাক্ষাতকার গ্রহণকালে উপজাতিদের মাঝে গণতান্ত্রিক পন্থায় দাবি আদায়ে বেশীর ভাগ উপজাতি আগ্রহী মনে হয়েছে। সাক্ষাতকারীদের মধ্যে সুকেশ্বর চাকমা মনে করেন, উপজাতিদের দাবি আদায়ে সরকারের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তি একটি ইতিবাচক সূচনা। সেক্ষেত্রে, শান্তিচুক্তির বিপক্ষে অবস্থানের চেয়ে এর আপাত সুবিধা গুলো গ্রহণ করা উচিত।

আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্টত দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য। জাতীয় জনসংহতি সমিতি এর সভাপতি ও পাবর্ত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) মনে করেন, পাবর্ত্য চট্রগ্রামে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল একটিই সেটি পাবর্ত্য চট্রগ্রাম জাতীয় জনসংহতি সমিতি। অপর দুটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ সম্পর্কে তার মতামত ইউপিডিএফ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। শুরু থেকেই এদের কাজ চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাস। আর নবগঠিত জেএসএস (বিক্ষুব্ধ) সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা বিক্ষুব্ধ, চক্রান্তকারী ও কুচক্রী। ক্ষুদে দলবাজি করার জন্য তারা দল থেকে বের হয়ে গেছে। দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তাদের পিছনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মদদ আছে।[৫]

অপরদিকে ইউপিডিএফ এর রাঙ্গামাটি জেলার সংগঠক শান্তি দেব চাকমা ও তাদের অঙ্গ সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা বলেন, ১৯৯৭ সালে সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর পাবর্ত্য চট্রগ্রাম জাতীয় জনসংহতি সমিতি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, পার্বত্য জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ারই ক্ষমতা ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। জেএসএস নেতারা প্রতিটি সরকারকে খুশি রেখে নিজেদের বিভিন্ন লাভজনক পদে বহাল রাখার কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন। পাহাড়ী জনগণের দাবি বাস্তবায়নের অবস্থান থেকে তারা সরে এসেছেন। অপর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল জেএসএস (বিক্ষুব্ধ) এর সহ-চেয়ারম্যান রূপায়ন দেওয়ান বলেন, রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কিছু সম্পর্কিত বিষয়ে বিরোধের কারণে তারা নতুন দল গড়তে বাধ্য হয়েছেন।[৬]

এভাবে পার্বত্য চট্রগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বন্দ্ব ও মতভেদের কারণে বিভিন্ন দলের অনুসারীদের মধ্যে বাড়ছে সশস্ত্র সংঘাত। তবে একটি দলও নিজেদের সশস্ত্র গ্রুপ থাকার কথা স্বীকার করে না। তবে প্রত্যেকটি দলই অপর দল গুলোকে সশস্ত্র সংঘাতের জন্য দায়ী করে। দীর্ঘদিন ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আক্রমনের শিকার হয়ে পার্বত্য চুক্তির পক্ষের একটি গ্রুপও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে তবে তাদের সঙ্গে জে,এস,এস'র কোন সম্পর্ক নেই। জেএসএস কোন অস্ত্রধারী গ্রুপ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে না। তিনি বলেন, চুক্তির আগে পার্বত্য চট্রগ্রাম গণ প্রতিরোধ বাহিনী, মুখোশ বাহিনী, টাইগার বাহিনী প্রভৃতি নামে যেসব অস্ত্রধারী গ্রুপ ছিল, যাদের 'কাউন্টার ইনসার্জেন্সি'র কাজে ব্যবহার করা হতো, ইউপিডিএফ সেরূপ একটি গ্রুপ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে ইউপিডিএফ এর নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা সশস্ত্র গ্রুপ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে না। তারা অভিযোগ করেন, ইউপিডিএফ কে নিশ্চিহ্ন করতে জেএসএস সশস্ত্র গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করে, ছোট খাটো আরও কিছু গ্রুপ সক্রিয় থাকতে পারে। পার্বত্য জনগণ আত্মরক্ষার্থে তাদের মোকাবেলা করছে। সশস্ত্র সংঘাত প্রসঙ্গে অপর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল জেএসএস (বিক্ষুব্ধ) সহ-চেয়ারম্যান রুপায়ন দেওয়ান বলেন, তারা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় দলগঠন ও পরিচালনা করতে চান। তাদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায় 'জে,এস,এস রিফর্মিষ্ট' নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপ সক্রিয় আছে। অনেকেই ভুল করে এই গ্রুপটিকে তাদের বলে মনে করে ভুল করেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক দল গুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী গ্রুপ পরিচালনার অভিযোগ করে।

তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্র প্রয়োগের খবর প্রায়শই পাওয়া যায়। গত ২৭শে জানুয়ারী ২০১০, জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা ও রাজা দেবাশীষ রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের সভায় যোগ দিতে খাগড়াছড়ি যাওয়ার সময় ইউপিডিএফ কর্তৃক তাদের গাড়ীবহরে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া ২০০৫ সালের জুলাই মাসে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেত্রী ইতিকা চাকমার অপহরণ ও ২০১০ সালে জনসংহতি সমিতির সদস্য অভিলাষ চাকমাকে হত্যার জন্য ইউপিডিএফ'কে দায়ি করা হয়।[৭] যদিও ইউপিডিএফ এই সকল অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তথাপি এই সকল অপহরণ, গুম, হত্যা সহ আঞ্চলিক দল গুলোর সশস্ত্র সংঘাতে অস্ত্রের ব্যবহার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে বাঁধার সৃষ্টি করছে। আঞ্চলিক পরিষদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনয়নে আঞ্চলিক পরিষদ ব্যর্থ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পারস্পরিক দোষারোপ প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি সশস্ত্র সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দলীয় কোন্দল ও সশস্ত্র সংঘাতকে ঘিরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি এখন সুদূর পরাহত। এ প্রসঙ্গে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় বলেন, একাধিক রাজনৈতিক দল থাকা কোন সমস্যা নয় বরং তা সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজে বহুমত বিকাশে সহায়ক। কিন্তু সমস্যা হলো সশস্ত্র সংঘাত। এই সংঘাত পার্বত্য সমাজে এক দুষ্ট ক্ষত হিসাবে বিরাজ করছে। অনেক তরুণ অকালে শেষ হয়ে যাচ্ছে। চাকমা রাজা বলেন, সশস্ত্র তৎপরতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হলে সংশ্লিষ্ট দল গুলোকে যেমন পরমতসহিষ্ণু হতে হবে তেমনি সরকারের সহযোগিতাও লাগবে। এই সংঘাত একটি রাজনৈতিক সমস্যা, সে হিসাবেই এটা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে হবে।[৮]

নজির বিহীন চাঁদাবাজি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র সংঘাতের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রামের ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবি, কৃষক, মৎসজীবি প্রভৃতি সব পর্যায়ের মানুষ চাঁদাবাজির শিকার। এই চাঁদা নেওয়া হয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গুলোর নামে। কিন্তু কোন দলের নেতৃত্বই চাঁদাবাজির কথা স্বীকার করে না। এ প্রসঙ্গে নাগরিক কমিটির অন্যতম সদস্য জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা বলেন, চাঁদাবাজি অনেকের জীবন জীবিকার মত হয়ে গেছে। বর্তমানে চাঁদাবাজির অধিকাংশই কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য হচ্ছে বলে মনে হয় না। সাক্ষাতকার গ্রহণকালে জীবন চাকমা বলেন, এই চাঁদাবাজি উপজাতিদের উপর অত্যাচারস্বরূপ। বর্তমানে এই চাঁদাবাজি এত মাত্রায় হচ্ছে যে, যার জন্য কোন উপলক্ষ্য ও উপযুক্ত কারণের দরকার পড়ে না এবং এটি নিবারণের কোন উপায় নেই। সাক্ষাতকারের সময় উপজাতিদের মধ্য থেকে আরও ৯ জন ঠিক অনুরূপ মতামত প্রদান করেন।

পার্বত্য চট্রগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারতো তবে এই নজির বিহীন চাঁদাবাজি পরিস্থিতি নিরসনে আঞ্চলিক পরিবদ ভূমিকা রাখতে পারতো। কেননা আঞ্চলিক পরিবদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে চুক্তির 'গ' অনুচ্ছেদে ৯ (গ) ধারায় স্পষ্টত বলা আছে তিন পার্বত্য জেলার সাধারন প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমস্যার সমাধান ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবে চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিবদ ক্ষমতার অভাবে চাঁদাবাজির মতো ঘটনা প্রতিরোধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে।

পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাব ঃ

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছাড়ে পাহাড়ী সংগঠনটি। শান্তি চুক্তির আওতায় আইনের মাধ্যমে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পরিবদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এমতাবস্থায় শান্তি চুক্তির বৈধতা প্রশ্ন করে দায়ের করা দুটি রিট আবেদনের ধারাবাহিকতায় হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর বেঞ্চ শান্তিচুক্তির আওতায় গঠিত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে। রায়ে শান্তিচুক্তিকে সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক সমঝোতা অভিহিত করে এর বৈধতা আদালতের বিবেচনার বিষয় নয় মন্তব্য করা হলেও কার্যত এ রায় চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাতিল করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (সংশোধিত) আইন বাতিলের রায়ে আদালত বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কোনো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নয়। এই আঞ্চলিক পরিবদকে বাংলাদেশের প্রশাসনিক

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আদালত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর রায়ের উদাহারণ টেনে বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ আইন রাষ্ট্রের একক চরিত্রের সাংবিধানিক ভিত্তিতে আঘাত হেনেছে। তাই আইনটি সংবিধান পরিপন্থী ও বাতিল ঘোষণা করা হলো।

আদালত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধিত) ১৯৯৮ আইন এর চারটি ধারা বাতিল করেছে। ১৫ ধারা বাতিলের বিষয়ে আদালত বলেছে, পার্বত্য তিন জেলায় যাবতীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারার পরিপন্থী। আদালত ওই আইনের ২৮ ধারায় পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান অসাংবিধানিক বলে বাতিল করেছে।

শান্তিচুক্তির বিষয়ে আদালত বলেছে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একই রাষ্ট্রে দুটি বিবাদমান পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি রাজনৈতিক সমঝোতা। এই চুক্তির মাধ্যমে সংঘাতে লিপ্ত দুটি পক্ষ তাদের অস্ত্র সমর্পনে সম্মত হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে তারা শান্তির শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে। সেজন্য এ চুক্তি সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আন্তর্জাতিক চুক্তির পর্যায়ে পড়ে না। আদালত অভিমতে আরো বলেন, চুক্তিটি কেবল রাজনৈতিক। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে। এটি সরকার ও উপজাতিদের মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলন সমাপ্তির জন্য করা হয়েছিল। এটি আদালতের বিচারিক হস্তক্ষেপের বিষয় নয়।

আদালত রায়ে পাঁচটি নির্দেশনা দেয়ঃ

০১. শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিনটি জেলা (বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি) পরিষদ আইন হওয়ায় চুক্তির আর কার্যকারিতা নেই। এ কারণে এর বৈধতা নিয়ে আদালতের বিবেচনায় প্রয়োজন নেই।

০২. সরকার ইচ্ছা করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আদলে বিকল্প হিসেবে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা করতে পারে, যার সদস্যরা হবে সরকার কর্তৃক মনোনীত।

০৩. তিনটি পার্বত্য জেলার শান্তি প্রক্রিয়ার সব রাজনৈতিক দল মতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার গুলো দীর্ঘ সময় অতিক্রম করলেও ওই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নাই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শাসন শান্তি প্রক্রিয়ার জীবন প্রবাহ; একে সব সময় উৎসাহ জোগাতে ও কার্যকর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

০৪. অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে কমিশন ও সংস্থা গঠনের নজির আছে। জীবনযাত্রা, আয়, শিক্ষা, জমির মালিকানা সহ সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে অনগ্রসরতা নির্ণয় করা হয়। আমাদের দেশের রাষ্ট্রও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে। এজন্য যৌক্তিক ও সুবিধাজনক পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে।

০৫. ভূ-কৌশলগত অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শান্তিচুক্তি হওয়ার প্রেক্ষাপট সহ সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে এগিয়ে নিতে হবে।

রিটকারীর পক্ষে ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ শুনানি করেন। রায়ের পর রিটকারীদের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেন, আদালত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। এখন পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ বলতে কিছু নেই"। আদালত রায়ে বলেছে এ পরিষদ বাংলাদেশের একক চরিত্র ধ্বংস করেছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে বাঙালিদের কিছু অধিকার লংঘন করা হয়েছিল। আদালত আইনের শাসনের পক্ষে রায় দিয়েছে। শান্তিচুক্তির অধীনে করা আইনে বাংলাদেশীদের যেসব অধিকার হরণ করা হয়, তা আদালত পুনরুদ্ধার করেছে।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে শুনানি করেন ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিষ্টার সারা হোসেন। পরিষদের পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণকারী জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন, আপিল বিভাগ রয়েছে, তাই এটিই চূড়ান্ত রায় নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে আইনী লড়াই চলবে। মামলায় সরকার পক্ষের কৌঁসুলি অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা বলেন, এই আদেশ পার্বত্য অঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি করবে, যা চুক্তির পুরো উদ্দেশ্যকেই বিপন্ন করে তুলবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রূপায়ন দেওয়ান জানান, এ রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল করবেন। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, আশা করি এ রায়ের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক পরিষদ এবং সরকারের পক্ষ থেকে আপিল করা হবে। আপিল করা অবশ্যই দরকার।[১০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটির সাংবধিানিক স্বীকৃতি না থাকায় এবং সাম্প্রতিক কালে হাইকোর্টের রায়ে আঞ্চলিক পরিষদ অবৈধ ঘোষণা হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে। যা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। যদিও আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কৃতিত্ব দাবি করে তাই সংযত কারণেই বর্তমান সরকারের সময় চুক্তিটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ ছিল, কেননা বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ই চুক্তিটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে নয়তো সরকার পরিবর্তনের ফলে আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোয়েন্দা সংস্থা ও আমলাদের নেতিবাচক প্রভাব ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ৮০ এর দশকে পাহাড়ীরা যখন নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও আত্মপরিচয়ের আন্দোলন করছিল, তখন সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের এই আন্দোলনকে চাকমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন হিসাবে সরকারের কাছে প্রপাগান্ডা (Propaganda) চালাতে থাকে। এবং সরকারকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ীদের আন্দোলন দমন করতে প্রভাবিত করে। তাছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মোবাইল নেটওয়ার্ক এর আওতার বাইরে রাখে। এখানে বসবাসরত স্থানীয়দের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় (২০০৬-২০০৭) পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয় এমন কোন উদাহারণ পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্রের ব্যবহার প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। এমন প্রশ্নের জবাবে সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের মধ্যে শুভ চাকমা, ত্রিদিব রায়, মৃণাল কান্তি ত্রিপুরার বক্তব্যে একই রকম সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের মতে, বর্তমানে পাহাড়ে যে সংহিংসতা ও অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে তা মুলত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে। যাতে করে জনসহতি সমিতির উপর দায় চাপিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান দীর্ঘায়িত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান বজায় রেখে সেনাবাহিনী কর্তৃক 'অপারেশন উত্তোরণ' এর মতো বিবিধ অপারেশন পরিচালনার স্বপক্ষে একটি অপচেষ্টা মাত্র। তবে সাক্ষাতকারে, বাসস'র স্থানীয় সাংবাদিক জহুরুল হক সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ইউপিডিএফ'কে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ মেনে নেননি। সাক্ষাতকার গ্রহণকালে সুকেশ্বর চাকমা তার মতামতে বলেন, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারের নিকট মিথ্যা প্রণোদিত তথ্য সরবরাহ করে চুক্তি অনুযায়ী অস্থায়ী সেনাছাউনি প্রত্যাহার না করে চুক্তির লংঘন করতে সরকারকে প্ররোচিত করছে।

এছাড়া বেসামরিক প্রশাসনের আমলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত পক্ষপাতদুষ্ট মন-মানসিকতা ও পার্বত্য উপজাতিদের প্রতি বৈরী মনোভাব পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে উৎসাহিত করে না।

Dhaka University Institutional Repository

আমলাদের অসহযোগীতার কারণে চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনে উপজাতিদের নিয়োগ প্রদান করে তাদের প্রাধান্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। আমলা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অনাগ্রহকে প্রভাবিত করে অথবা পার্বত্য সমস্যা নিরসনে সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি অনুপস্থিত।

সার্বজনীনতার অভাব :

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে রাষ্ট্রের জাতীয় বিষয় গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার নজির নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রের চরম প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে মতানৈক্য থাকতেই পারে কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনে সব রাজনৈতিক দল গুলোর অংশগ্রহনে একটি সার্বজনীন সিদ্ধান্তের অভাব বাংলাদেশের একটি অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা। অথচ বিগত দিনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, জাতীয় ইস্যু গুলোতে রাজনৈতিক দল গুলোর একমত হওয়ার উদাহারণ বিরল হলেও একেবারেই অনুপস্থিত নয়। নব্বই'য়ের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক সরকারের পতনের পর সরকার হিসাবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর ক্ষমতা গ্রহণ ও নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া; রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি রাষ্ট্রের জাতীয় প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলোর একত্রিত হওয়ার উদাহারণ আছে। এরূপ জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ আজও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। বরং ক্ষমতার পালা বদলে পরবর্তীতে যারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠীত হয়েছেন, তা সব রাজনৈতিক দলই মেনে চলেছেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসা সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করা হয়েছিল তা সকল রাজনৈতিক দল গুলোর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় থেকেই বি,এন,পি; জামায়াতে ইসলাম; জাতীয় পার্টি এই চুক্তির বিপক্ষে অবস্থান করেছিল। রাষ্ট্রের এরূপ জাতীয় সমস্যা সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর পরস্পরের এই বৈপরীত্য অবস্থান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সার্বজনীনতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি সে সময় (১৯৯৬-২০০০) প্রধান রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো চুক্তিটিকে অসাংবিধানিক ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অবিহিত করেছিল। এরুপ প্রকাশ্য বিরোধীতার পরও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কোনরূপ সংলাপ, আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ না করে সরকারের একক সিদ্ধান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করে। তাই পরবর্তী সরকারের সময় গুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। আর তাই চুক্তি সম্পাদনের প্রায় ১৬ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। চুক্তি সম্পাদনের পর বিগত ১৬ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সরকার পরিচালনা করেছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ও জামায়াত সমর্থিত চার দলীয় ঐক্যজোটের সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার। চুক্তি সম্পাদন পরবর্তী বিএনপি, জামায়াত সমর্থিত চার দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যজোট সরকার চুক্তিটিকে বাতিল না করলেও চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে ছিলেন উদাসীন। বরং চুক্তির বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, চুক্তির অনেক ধারা উপধারা লংঘন করা হয়েছে।

মূলত স্বাধীনতাত্তোর সকল রাজনৈতিক সরকারের সময়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। জিয়াউর রহমান সরকারের সময় থেকে এরশাদ সরকার সময় পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় সমাধানের চেয়ে সামরিক অবস্থান ও সামরিক শক্তি প্রয়োগে সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনকাল (১৯৯১-১৯৯৫) থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি রাজনৈতিক উপায়ে এর সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে সে সময় সরকারের বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী ও সরকারের একাধিক কমিটি ও উপ-কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির সংলাপ ও আলোচনা চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শেখ হাসিনা সরকারের সময় (১৯৯৬-২০০০) সম্পাদিত হলেও এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল আরও আগে থেকেই। তাই স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বি.এন.পি ও অপরাপর প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোর সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্য গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হলে পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন হলেও চুক্তি বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো।

অপরদিকে, সরকার যেমন অপরাপর প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোর মতামতকে গুরুত্ব দেয়নি, ঠিক তদ্রুপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় অন্যান্য আঞ্চলিক দল-উপদল ও স্থানীয় বাঙালিদের কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকায় চুক্তিটিতে তাদের চাহিদাগুলো সরকারের কাছে গুরুত্ব হারায়। এমতাবস্থায়, পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালিদের বসতি ও জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বেড়ে প্রায় উপজাতিদের জনসংখ্যার সমান হতে চলেছে। বর্তমানে বাঙালিরাও বিবিধ দাবি আদায়ে তারাও নানা দল ও উপদলের আশ্রয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। স্বভাবতই পাহাড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিবিধ ধারা-উপধারা নিয়ে বিরোধিতা করে আসছে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়, চুক্তিতে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনাছাউনী সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে, সেখানে বাঙালিরা অস্থায়ী সেনাছাউনী তুলে নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নিরাপত্তাহীনতার দাবি তুলে আন্দোলন করছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকালে জনসংহতি সমিতি ব্যতিত স্থানীয় আঞ্চলিক দল-উপদল ও স্থানীয় বাঙালিদের দাবি-দাওয়া ও তাদের মতামত গ্রহণ না করার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালিদের মাঝে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরোক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পাহাড়ে অবস্থিত সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় না। বরং এতে চাকমা সম্পদায়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপজাতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সমান বা সমানুপাতিকও নয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিদের অধিকার ও দাবি আদায়ের একমাত্র সার্বজনীন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনও নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন উপজাতিদের অপরাপর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও উপদল আছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় থেকেই ইউপিডিএফ চুক্তিটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করে আসছিল। চুক্তি পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ভেঙ্গে জেএসএস (বিক্ষুব্ধ) দলে বিভক্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায়ই পার্বত্য চট্টগ্রামে এই রাজনৈতিক দল গুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষ নিহত ও হতাহত হচ্ছে।

রাষ্ট্রের একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে গড়ে উঠতো তবে বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়নে পরস্পরের সংকীর্ণতা ও স্থবিরতা দূর করা সম্ভব হতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে স্থবিরতার জন্য চুক্তিটির সার্বজনীনতার অভাব একটি অন্যতম কারণ।

আঞ্চলিক পরিষদে চাকমা ও মারমাদের প্রাধান্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী যেভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে তাতে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে চাকমা ও মারমাদের প্রাধান্য ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অনুপস্থিতি তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে কিভাবে ভূমিকা রাখবে অথবা চুক্তি অনুযায়ী চাকমাদের প্রাধান্য কতুটুকু গণতান্ত্রিক? সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে এর উত্তরে যে কারণটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর একাত্মতা রয়েছে। মূখ্য বিষয়টি হচ্ছে আন্দোলনের লক্ষ্যের সাথে অন্যান্য ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গুলোর স্বার্থের মিল থাকা। সেক্ষেত্রে চাকমা কিংবা মারমাদের প্রাধান্য বিষয়টি মূখ্য নয়। আঞ্চলিক পরিষদে চাকমাদের প্রাধান্য অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীগুলো তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে না। বরং আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাবই ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার সমূহ সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের মধ্যে শুভ চাকমা, অম্লান চাকমা, অরবিন্দু ত্রিপুরা, ত্রিবিদ তংচৈঙ্গা প্রমুখ তাদের মতামতে বলেন, মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত আঞ্চলিক পরিষদ আদৌ প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত হয়েছে কিনা ? যেখানে চুক্তি সম্পাদনের পর আজও আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর হয়নি সেখানে আঞ্চলিক পরিষদে চাকমাদের প্রাধান্য বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হওয়া না হওয়া কোন অর্থ বহন করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পাহাড়ে অবস্থিত সকল ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব না থাকায় অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায় অসন্তুষ্টি জানিয়ে আসছে। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায়ই প্রতিটি ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও ধর্মের ভিন্নতা। আর তাই স্বভাবতই চাকমা যেমন মুরংদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না তেমনি মারমা কখনও খিয়াংদের প্রতিনিধিত্ব করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। ফলে চুক্তিটিতে চাকমা ও মারমাদের প্রাধান্য অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতির জন্য অসন্তুষ্টির কারণ। আর এভাবে আঞ্চলিক পরিষদে ক্ষুদ্র উপজাতি গোষ্ঠী গুলোর প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ বনাম ভোটের রাজনীতি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করার পিছনে অন্য একটি কারণ হচ্ছে ভোটের রাজনীতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে বাঙালি ও উপজাতিদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার প্রায়ই সমান। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী পক্ষের জনগণকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী নয়। চুক্তিটি সম্পাদন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিরা চুক্তিটির বিরোধীতা করে। বিশেষ করে চুক্তির কিছু কিছু ধারা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের জমি ক্রয় করতে না পারা; অ-উপজাতীয়দের প্রার্থীতার জন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের সার্টিফিকেট/পরিচয় পত্র সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালিরা তাদের আপত্তি জানিয়ে আসছিল। তাদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাঙালিদের কতিপয় অধিকারকে খর্ব করেছে যা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী ও সাংবিধানিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই পার্বত্য চট্রগামে বাঙালিদের চুক্তি বিরোধী মনোভাব পরোক্ষভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম বাঁধা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের সমর্থন প্রতিটি রাজনৈতিক দল গুলোর কাছে প্রয়োজনীয় বিধায়, সরকার গঠনের পর চুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা বা কালক্ষেপন করে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিবিধ এলাকায় বাঙালি ও উপজাতিদের আনুপাতিক হার জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। বিগত সময়ের স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে তুলনামূলক ভাবে শহরের দিকে যেখানে বাঙালিদের বসবাস বেশী সেখানে বাঙালি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন আর পাহাড় বেষ্টিত দুর্গম এলাকা গুলোতে উপজাতিরা অধিক বিধায় সেখানে উপজাতি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পার্বত্য জেলা শহর গুলোতে বাঙালিদের বসবাসের আধিক্য আর গ্রামঞ্চল ও পাহাড়ে উপজাতিদের বসবাসের হার বেশী। ভোটের রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলো এক ধরণের দ্বৈতনীতি গ্রহণ করে। একদিকে রাজনৈতিক দল গুলো পাহাড়ীদের চুক্তি বাস্তবায়নে আস্বস্ত করে অপরদিকে চুক্তি বিরোধী পক্ষ গুলোকে সন্তুষ্ট করতে সরকার আঞ্চলিক পরিবদকে ক্ষমতায়িত করতে চায় না। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও বাঙালিদের বসবাসের সাম্প্রতিক হার তথা ভোটের রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অন্তরায়।

শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য পরিষদ আইন ১৯৯৮ যখন সংসদে আইন আকারে প্রণীত হয় তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য পরিষদ বিলুপ্ত করার ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল না কিন্তু পার্বত্য পরিষদ আইন বিলটি পাশের সময় সরকারের হাতে পরিষদ বিলুপ্তির ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া শান্তিচুক্তি অনুযায়ী, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবে। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতি জনগণের কল্যাণের পথে বিরুপ ফল হতে পারে এরুপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবে। কিন্তু পার্বত্য পরিষদ আইন ১৯৯৮ বিলটি সংসদে পাশ করার সময় এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে সরকার পার্বত্য পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পাশ করার মাধ্যমে পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে দুর্বল করে প্রকারন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকেই দুর্বল করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ যদি যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারতো তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনে আঞ্চলিক পরিষদ ভূমিকা রাখতে পারতো। কেননা আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্যে চুক্তির 'গ' অনুচ্ছেদের ৯ (গ) ধারায় স্পষ্টত বলা আছে, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমস্যার সমাধান ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবে চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির যে আশা করা হয়েছিল তা সুদূর পরাহত।

ক্ষমতা / শক্তির আধিপত্য ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের স্থবিরতার অন্যতম কারণ হতে পারে শক্তি ও ক্ষমতার আধিপত্য। পাহাড়ীদের দীর্ঘ সময়ের আন্দোলন, সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিদ্রোহ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করতে প্রভাবিত করে। এক সময় পার্বত্য সমস্যাটিকে সামরিক বিবেচনায় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনী উভয় পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পার্বত্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। সামরিক বিবেচনায় সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে দেশ-বিদেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সরকারের এরূপ ভূমিকায় সমালোচনা করে। পাহাড়ীদের সশস্ত্র সংগ্রাম সরকারকে রক্তক্ষয়ী পরিণতি ব্যতিরেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করে। সরকারের চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহের চেয়ে পাহাড়ীদের আন্দোলন সংগ্রামের চাপেই সরকার চুক্তি সম্পাদন করেন। সরকারও পাহাড়ে এই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান করতে পাহাড়ীদের দাবি-সমূহের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়। পাহাড়ীদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অস্ত্রমুক্ত করতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করতে প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু চুক্তির প্রায় ১৬ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের মধ্যে সৌরভ বড়ুয়া, লিটন দেওয়ান, কোচিনু মারমা, ললিত কুমার চাকমা প্রমুখ মনে করেন, বর্তমানে পার্বত্য উপজাতিদের সংগ্রামের প্রেক্ষাপট সশস্ত্র না হয়ে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর অধীনে হওয়ায় সরকার এখন চুক্তি সম্পাদন করেও তা বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিষয়টি বৈশ্বিক রাজনৈতিক আলোকে তুলনা করলে দেখা যায়, একটি দুর্বল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দর কষাকষিতে তেমন লাভবান হওয়ার আশংকা থাকে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় প্রায়শই উন্নত দেশগুলোর মনোভাবের উপর নির্ভরশীল করে থাকে। তদ্রুপভাবে যেহেতু পার্বত্য উপজাতিরা বর্তমানে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করেছে তাই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর অধীনে সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ করে ব্যর্থ হচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অনাগ্রহ পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি ঠেলে দিচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়নে পাহাড়ীরা যদি পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামে ফিরে যায়, স্বভাবতই তা হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর মদদে মধ্যস্বত্বভোগী উপজাতি শ্রেণীর উদ্ভব ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীতে পার্বত্য উপজাতিদের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত ও পৃষ্টপোষকতা করার মাধ্যমে একদল উপজাতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপজাতিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি প্রাধান্য দেওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডা বাস্তবায়নে অধিকতর মনোনিবেশ করে থাকে। অর্থাৎ দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন করতে এ উপজাতি শ্রেণী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকে। পার্বত্য জেলায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক পরিধি বিস্তৃত করেছে। বিবিধ স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নির্বাচন থেকে সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রার্থীর জয়লাভে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া রাজনৈতিক পদ, রাজনৈতিক নিয়োগ, মনোনয়ন, প্রশাসনের বিবিধ পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রভৃতি প্রণোদনার মাধ্যমে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় উপজাতিদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। আর যে কোন রাজনৈতিক বিবেচনা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোবকতা পেতে চাই দলীয় আনুগত্য ও দলের পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়ায় উপজাতিরা তাদের স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপকার থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ উপজাতিদের রাজনৈতিক অধিকার সমূহ অনুশীলনের সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনার মাধ্যমে উপজাতি সমাজে মধ্যস্বত্বভোগী উপজাতি শ্রেণীর উদ্ভব ঠেকাতে পারছে না। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের আন্দোলন ক্রমাগতভাবে এক ধরণের মত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈততা ও সংশয়ের সৃষ্টি করছে। যা কিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের কঠিন আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনপ্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নে নির্বাচিত হয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে পাহাড়ীদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ না করে বরং তারা প্রায়শই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস উপজাতিদের মাঝে প্রচার করে থাকে। পার্বত্য উপজাতি নেতারা যখন চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অনাগ্রহকে তুলে ধরে চুক্তি বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন তখন সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আশ্বাসকে সরকারের ন্যায় পাহাড়ীদের মাঝে বিস্তৃত করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দলগুলোর নেতারা যখন চুক্তি লংঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করেন, তখন সরকার দলীয় সাংসদগণ চুক্তি বাস্তবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া বলে পাহাড়ীদের মাঝে প্রচার করেন। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্য থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ললিত কুমার চাকমার মতামতটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় যারা নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হচ্ছেন তারা উপজাতি হলেও তারা যে পাহাড়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে এমনটি বলা যাবে না। বরং জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর আনুগত্য পেতে উপজাতি জনপ্রতিনিধিরাও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে একাত্ম নয়। বরং চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তারা একাত্ম হয়ে সরকারের (রাজনৈতিক দলের প্রতি) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।

তাছাড়া সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল চীফ বা পার্বত্য রাজাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে স্থানীয় রাজারাও পার্বত্যবাসীদের জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা নিজেদের যাই মনে করুক তারা হলেন বাস্তবে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। তাই তারা নিজেদের মান-মর্যাদা রাখার স্বার্থে সব সময় রাজার দলে (King's party) থাকতে পছন্দ করেন। যে দল ক্ষমতায় থাকে, তারা সে দলের সমর্থক হন এবং সেই দলের স্বার্থে কাজ করেন। এতে তাদের প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক সে বিষয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তারা ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে কথা বলবেনই।[১১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ গুলোতে বিবিধ নিয়োগে উপজাতিদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। পার্বত্য জেলা পরিষদের এসব নিয়োগে আপাত দৃষ্টিতে উপজাতিদের প্রাধান্য নিশ্চিত হলেও এই নিয়োগ গুলো উপজাতিদের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর মধ্য থেকে পূর্ণ করা হয়নি। বরং সরকার দলীয় আনুগত্য প্রদর্শনের মাপকাঠিতে পার্বত্য জেলা পরিষদের বিবিধ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের বিবিধ নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকার দলীয় রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তবে স্পষ্টতই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এদের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলই হবে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্ম পরিধি বিস্তৃত করার মাধ্যমে উপজাতিদের দাবি-দাওয়া গুলোকে সরকার কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

সুশাসনের অভাব ও সংখ্যালঘু ধারণা ঃ

একটি দেশে যখন সুশাসনের অভাব দেখা দেয় তখন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর দাবি গুলোকে পদদলিত করা হয়। ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতিরা যখন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সভা, সমাবেশ, মানববন্ধন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে দাবি আদায়ের আন্দোলন করে তখন সুশাসনের অভাবে সরকারের মধ্যে তাদের এই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচী গুলো আকাঙ্ক্ষিত ফল পায়না। উপরোন্ত সরকার যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে সংখ্যালঘু ধারণা থেকে বিচার করে তখন এমনিতেই পার্বত্য উপজাতিরা তাদের অধিকারগুলো উপভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যে কোন গোষ্ঠীর দাবি গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার অভাবে পরবর্তীতে তা সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে। তদ্রুপভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বকীয় পরিচয়ের দাবিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেওয়ার পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি শান্তিবাহিনী গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামে উপনীত হয়। সাক্ষতকার গ্রহণকালে সুকেশ্বর চাকমা বলেন, যদি সুশাসন উন্নত না হয় তবে উপজাতিদের দাবি আদায়ে সভা, সেমিনার করে কি লাভ ? অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় অম্লান চাকমার সাক্ষাতকারে, তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা উপজাতিদের ন্যায় সংগত শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর অধীনে আমাদের উত্থাপিত দাবি সমূহের প্রতি সরকারের সম্মান প্রদর্শন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্বারা দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আপাত সমাপ্তি হলেও চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সরকার পাহাড়ীদের পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করছে। সুশাসন ও গণতন্ত্র অনুশীলনের দীর্ঘ ইতিহাস না থাকায় সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা বন্টন করছে না। আর চুক্তি অনুযায়ী বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না করাটা সরকারের সুশাসন ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী।

বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও নব্য এলিট শ্রেণীর উদ্ভব ঃ

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে বিভিন্ন বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা, মিশন, এনজিও, বেসরকারী সংস্থা সমুহ বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সকল উন্নয়ন বরাদ্দের বেশির ভাগই ব্যয় হয় অষকাঠামোগত উন্নয়নের পিছনে। কিন্তু উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষুদ্রতম একটি ভগ্নাংশ মাত্র পৌঁছায় উপজাতিদের মাঝে। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ, কর্ণফুলী পেপার মিল প্রভৃতি উন্নয়ন কাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ীদের উপকারে আসেনি বরং সেই সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল সেখানকার স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশের অপারপর স্থানে স্থানান্তর করা। বর্তমান কালেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবিধ উন্নয়নের নামে কার্যত তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ হননের চেষ্টা করা হচ্ছে। বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য ও সহযোগিতার নামে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রাসের এক ক্ষেত্র গড়ে তুলছে। পাশাপাশি বৈদেশিক সংস্থাগুলো উন্নয়ন সাহায্য ও সহযোগিতার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নব্য উপজাতি এলিট শ্রেণী তৈরি করেছে। আর এই নব্য উপজাতি এলিট শ্রেণীদের ব্যস্ত রাখছে অর্থ সাহায্য ভাগাভাগির প্রতিযোগিতায়। বৈদেশিক সাহায্য পেতে স্থানীয় ভাবে গড়ে উঠছে বিবিধ এনজিও যারা মূলত এই উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার হিসাবে অর্থ প্রাপ্তির পিছনে ব্যস্ত। এই অবস্থার ফলে পার্বত্য চট্রগামে উপজাতিদের মাঝে একটি শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পার্বত্য উপজাতিদের মাঝে একটি চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সাক্ষাতকার গ্রহণকালে সং হোয়াই চিং, ত্রিদিব রায়, উছায়ি মং মারমা প্রমুখ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহে অনেক উপজাতিদের কর্মসংস্থান হয়েছে। বৈদেশিক উন্নয়ন ও এন,জি,ও সমূহ উন্নয়ন কাজের পাশাপাশি শিক্ষিত উপজাতিদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ করতে পারলেও দরিদ্র উপজাতিদের জন্য তা কল্যাণের চেয়ে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণী বৈষম্য উপজাতিদের ঐক্য ও সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

অর্থনৈতিক ভাবে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই নব্য এলিট শ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক মেরুকরণে ভূমিকা রাখে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নব্য এলিট শ্রেণীর উদ্ভবে পার্বত্য উপজাতিরা আন্দোলন থেকে দূরে সরে আসছে। একমাত্র আঞ্চলিক পরিষদই স্থানীয় উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণে অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না থাকায় এটি পার্বত্য উপজাতিদের কোন সুবিধা প্রদান করতে পারছে না। ফলে উপজাতিরা দিন দিন বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

উপরের লিখিত আলোচনা থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে এটিকে কার্যকর করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নানা অনুশীলন তথা সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, নির্বাচন ও ভোটের অধিকার,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার মতো অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হলে স্থানীয় উপজাতিরা আঞ্চলিক পরিষদ হতে সুযোগ, সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পাহাড়ীরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র ঃ

১. Chowdhury, N. J. (2009). The Chittagong Hill Tracts Accord Implementation in Bangladesh : Ideals & Realities. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, *Volume : XXV*No 2.

২. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। *জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়*। পৃ- ১১০, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী।

৩. ২ ডিসেম্বর ২০০৯, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৪. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। পৃ- ৪১, op.cit.

৫. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৬. পূর্বোক্ত

৭. ১০ নভেম্বর ২০১০, *৮৩ স্মরণে*। তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি : রাঙামাটি।

৮. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০, *দৈনিক প্রথম আলো*।

৯. ১৩ এপ্রিল ২০১২, *bd news24.com*।

১০. পূর্বোক্ত

১১. চাকমা, শরদিন্দু শেখর (২০০৪)। পৃ- ৯৮, op.cit.

Dhaka University Institutional Repository

৮ম অধ্যায়

মূল্যায়ণ

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ইতিপূর্বে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাহাড়ীদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না বিধায় পাহাড়ীরা আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতায়নে আগ্রহী হয়। সরকার ও জনসংহতি সমিতি পরস্পরের এই চুক্তিতে আগ্রহী হওয়ার নেপথ্য উৎসাহ মূলত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বব্যাপি বহু জাতিগত সমস্যা সমাধানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মাধ্যমটি শান্তি প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কতিপয় অধিকার সমূহ অনুশীলনের সুযোগ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সফলতা নির্ভর করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পাহাড়ীরা এই সকল অধিকার সমূহ অনুশীলন করতে পেরেছে কিনা? ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অঞ্চলিক পরিষাদের ক্ষমতায়ন কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে গবেষণার এই পর্যায়ে প্রশ্নটির সমাধান অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

যেকোন একটি চুক্তি সকলের সব দাবি-দাওয়াকে একত্রে ধারণ করতে পারে না। বরং চুক্তির শর্ত উভয় পক্ষের মেনে চলার সম্মতির উপরই নির্ভর করে চুক্তির সার্থকতা। তদ্রুপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে চুক্তিটির সার্থকতা। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা চুক্তির আওতায় সাধারণ ক্ষমা বিবেচনায় সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দিলে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান হয়। বর্তমানে পাহাড়ীরা তাদের দাবি-দাওয়া সমূহ সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার, মানববন্ধনের, মতো শান্তি পূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারের কাছে উপস্থাপন করছে। তাছাড়া চুক্তির ফলে দীর্ঘদিন ধরে পাশ্ববর্তী দেশ সমূহে স্থানান্তরিত শরণার্থীরা পুনরায় দেশে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। বিশ্বব্যাপি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য উপজাতিদের সংকট নিরসনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশি দাতাগোষ্ঠী, এন,জি,ও সমূহের অর্থনৈতিক সাহায্য তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদের ব্যবহার ও বিপনণে আগ্রহ দেখাচ্ছে। স্থানীয় পাহাড়ীরা তাদের কৃষিজ ও মৎস্য সম্পদ বাণিজ্যিকভাবে দেশের অপরাপর স্থানে সরবরাহের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অনুকূল ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে কতিপয় ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও পার্বত্য সংকট নিরসন করে স্থায়ী শান্তির যে আশা করা হয়েছিল তা আজও আশানুরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি আরেকটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের হাতে স্থানীয় বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন; উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা; মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; স্থানীয় পর্যটন; স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান এরূপ স্থানীয় পর্যায়ের অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা দরকার তা দেয়া হয়নি। বরং স্থানীয় সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদ পরস্পরের প্রতিযোগি ফলে আঞ্চলিক পরিষদ তাদের কাজের সমন্বয় করতে পারছে না। সরকার এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলি সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, Hill District Council, স্থানীয় সরকার পরিষদ (পৌরসভা, ইউনিয়ন) প্রভৃতির মাধ্যমে পরিচালিত করছে। চুক্তি অনুযায়ী সরকার আঞ্চলিক পরিষদের কাছে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব যথেষ্টভাবে বন্টন করছে না, যা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের শর্তকে লংঘন করে।

আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর করতে হলে এর জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা, প্রশাসনিক অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট করা জরুরী। সুস্পষ্ট লিখিত নীতিমালার অভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যত অচল। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রণালয়কে অধিকতর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দিয়ে মূলতঃ আঞ্চলিক পরিষদকে আরও দুর্বল ও অকার্যকর করে রেখেছে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব স্থানীয় পাহাড়ীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়াস পেয়েছিল তা সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অর্থবহ করতে হবে। পার্বত্য উপজাতিরা স্বায়ত্বশাসনের দাবি থেকে সরে এসে তারা আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নে আস্থা রাখে। চুক্তির প্রতিটি প্রস্তাবনার পিছনে যে বিষয়টি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে তা হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন। কিন্তু সরকার চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়িত করার কথা বললেও মূলত কৌশলে CHT Regional Clouncil Act 1998 পাশ করার মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতাকে অবনমিত করেছে। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও আঞ্চলিক পরিষদ তার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা ও অবকাঠামোগত ধারণা না থাকায় আঞ্চলিক পরিষদ মূলত ব্যর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রগতি ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যাস্ত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেগুলি প্রায়শই পাশ কাটিয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায়শই আঞ্চলিক পরিষদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে বিবেচনা না করে পরিষদের বাজেট তৈরী করে। ফলশ্রুতিতে এরূপ বাজেট স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনকে মূল্যায়িত করতে পারে না। অনুরূপভাবে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকলেও লোকবল, অর্থ ও অবকাঠামোগত দূর্বলতায় স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক পরিষদ অনেকটাই অকার্যকর। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তদনি স্তরের সকল সদস্যদের নিয়োগ, বদলি ও শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবিধান তা আঞ্চলিক পরিষদ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে নাই। ফলে স্থানীয় আইন শৃংঙ্খলা রক্ষায় আঞ্চলিক পরিষদ পুলিশকে ব্যবহারের কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া প্রশাসনের আমলা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, এলিটদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় গুলো আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এভাবে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ণের অভাব স্থানীয় পহাড়ীদের মাঝে আস্থার পরিবেশ তৈরী করতে পারে নাই। বরং স্থানীয় ক্ষমতায়নের অভাবে পাহাড়ীদের মাঝে ধীরে ধীরে ক্ষোভ ও বঞ্চণার ধারণাকে আরও প্রকট করছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় পাহাড়ীরা মনে করে, সরকার যেহেতু গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর অধীনে পাহাড়ীদের স্থানীয় ক্ষমতায়নের উপর মনোযোগ দিচ্ছে না তাই পাহাড়ীরা পুনরায় সশস্ত্র বিদ্রোহে ফিরে গেলে তা হবে শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত ব্যর্থতা। এভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। সুতরাং চুক্তির ধারা, উপধারা প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলা, শুল্ক ও রাজস্ব আদায়, নিজস্ব বাজেট তৈরীর ক্ষমতা প্রভৃতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে পার্বত্যবাসীকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল শান্তি নিশ্চিত করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদের প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়ন অপরিহার্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আরেকটি জটিলতা হচ্ছে এর সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাব। এটা স্বীকৃত যে চুক্তির ধারা-উপধারা (Contractual Law) যদি সাংবিধানিক আইনের (Constitutional Law) পরিপন্থী হয় তাহলে চুক্তির ধারা, উপধারা গুলো আদালতের রায়ে অকার্যকর হয়ে যাবে। ইতোমধ্যেই হাইকোর্ট সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় চুক্তিটির বিবিধ ধারা-উপধারা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এছাড়া হাইকোর্ট তার আদেশে আঞ্চলিক পরিষদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। যদিও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার হাইকোর্টের আদেশের স্থগিতাদেশ পেয়েছেন কিন্তু সরকার পরিবর্তন হলে চুক্তিটির ভবিষ্যত ও আঞ্চলিক পরিষদের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টি হবে। এরূপ অবস্থায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পারেতা, কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

বিল পাশের মাধ্যমে চুক্তিটির সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী সরকারের সময় কার্যত অচল হতে পারে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, সম্পত্তি ভোগের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাহাড়ীরা ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হবার অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে শান্তিচুক্তি করতে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্রগ্রামে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল স্থাপন, ১৯৬০ সালে রাঙামাটিতে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন,স্বাধীনতার অব্যহতি পূর্বে পার্বত্য চট্রগ্রামের বেতবুনিয়ায় একটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন, আশির দশকে পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক বাঙালি লোকের বসবাস প্রভৃতি কারণে পার্বত্য চট্রগ্রামের সহস্রাধিক উপজাতি পরিবার হয়েছে বাস্তুহারা ভুমিহীন। কিন্তু শান্তিচুক্তির পরও পাহাড়ীদের ভূমির উপর তাদের অধিকার ফিরে পায়নি। চুক্তি সম্পাদনের পরে সরকার নিজেও আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা না করেই জমি অধিগ্রহণ করে চলেছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে শুধু সরকারীভাবে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে তা নয় সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, শিল্পপতি, এনজিও, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত এখানে ভূমি দখল ও ভূমি ইজারা দেয়া নিচ্ছে যা চুক্তির লংঘন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিগ্রহণ, ইজারা বাণিজ্য প্রভৃতি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরেও অব্যাহত রয়েছে। প্রভাবশালী সামরিক, বেসামরিক এলিটদের দ্বারা ভূমি দখল অব্যাহত থাকায়, আজও পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিরা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে অমিমাংসিত বহুবিধ সমস্যা, ক্ষোভ, বঞ্চণার পেছনে রয়েছে এ অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত না হাওয়ায় উপজাতিরা তাদের সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ রোধ করতে চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া প্রভাবশালীদের অবৈধ দখল, ইজারা বাণিজ্য ঠেকাতে পরিষদের পূর্বানোমোদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের দূর্বলতায় একদিকে যেমন উপজাতিদের বাস্তচ্যুত হওয়া ঠেকানো যায়নি, তেমনি বাস্তচ্যুত উপজাতিদের পুনরায় তাদের নিজ জমিতে পুনর্বাসিত করা যায়নি। চুক্তি অনুযায়ী উপজাতি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যথাশ্রীর্ঘ পার্বত্য চট্রগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ বাছাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করে উপজাতিদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে। অথচ ভূমি কমিশন আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা না করেই আগে ভূমি জরিপের উদ্যোগ নিয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে পাস কাটিয়ে এভাবে ভূমি কমিশনের একক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয় নাই। ক্ষমতায়নের অভাব আঞ্চলিক পরিষদকে ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা সমাধান করে পাহাড়ীদের মাঝে ভূমির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থতা প্রকারন্তরে পাহাড়ীদের মাঝে শান্তির যে প্রত্যাশা ছিল তা ধীরে ধীরে ব্যর্থ হতে চলেছে।

আজও পার্বত্যবাসী উপজাতি তাদের স্থানীয় সম্পদ ভোগের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পরও খাগড়াছড়ির সেমুতাং এলাকায় প্রাপ্ত গ্যাস উত্তোলন করে পাইপ লাইন সংযোগের মাধ্যমে তা চট্টগ্রামে সরবরাহ করা হয়েছে অথচ পার্বত্যবাসী এই গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত না হওয়ায় স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে উপজাতিদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। পাকিস্তান আমলে যেরূপ প্রকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, স্থানীয় বনের বাঁশ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপন করা হয়েছিল অথচ স্থানীয় এই সকল প্রকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের সুফল থেকে পার্বত্যবাসী পাহাড়ীরা বঞ্চিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে সাম্প্রতিক কালেও খাগড়াছড়ির সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস ব্যবহারে স্থানীয় পার্বত্যবাসী বঞ্চিত হয়েছে। অথচ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের এই গ্যাস ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় শিল্প কারখানা স্থাপন করে উপজাতিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উপজাতিদের জাতীয় অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারতো। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে উপজাতিদের সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিবিধ আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানী গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস ও তেল উত্তোলনের যে আগ্রহ দেখিয়েছে তা কাপ্তাই বাঁধের ন্যায় পুনরায় উপজাতিদের মাঝে বাস্তুচ্যুত হবার আশংকা সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত শান্তিচুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে তেল ও গ্যাস উত্তোলণে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাশাপাশি পার্বত্যবাসীদের মাঝে বাস্তুহারা হবার যে আশংকা তা দূর করে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপর পার্বত্য বাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হলে চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে আইন প্রণীত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০০১ এবং বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা বা পরামর্শ গ্রহণ না করেই আইন প্রণয়ন করেছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে আইন প্রণয়ন করায়, তা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কল্যাণে আসেনি। পার্বত্য উপজাতিদের ভূমির অধিকার প্রশ্নে সরকার শুধু আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়েই যায়নি বরং ভূমি কমিশন আইন প্রণয়ন করে চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধাত্মক ধারা প্রণয়ন করে আঞ্চলিক পরিষদকে আরও দুর্বল করেছে। এভাবে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পার্বত্য ভূমি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীরা তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রায়শই বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সেনাবাহিনী কর্তৃক উপজাতি নেতাদের আটক করা ও তাদের চলাচলে উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিযোগ পাওয়া যায়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘণের শামিল। পার্বত্য উপজাতি নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ব্যবহারকে বন্ধ করতে জোর দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের মতে, দেশের অপারাপর স্থানের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ভার পুলিশের হাতে ন্যাস্ত থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্কিত। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকার কথা থাকলেও সরকার আজও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক পরিষদ ব্যর্থ হয়েছে। কেননা চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ পাহাড়ীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারার মূল কারণ আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না হওয়া। এভাবে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পাহাড়ীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ব্যর্থতা তাদেরকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করছে। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ সেনাবাহিনী কতৃক পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পাহাড়ীদের বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করছে। চুক্তি অনুযায়ী আজও সেনাবাহিনীর অস্থায়ী সব সেনাছাউনী প্রত্যাহার করা হয়নি। সরকার যেখানে জাতীয় নির্বাচনের মতো ইস্যু গুলোতে সেনাবাহিনী নিয়োগের বিরোধিতা করে, সেখানে চুক্তিতে উল্লেখ থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবহিনীর ভূমিকা অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা শাখার প্রভাবিত করার বিষয়টি পাহাড়ীদের সম্পর্কে সকরারকে ভুল ধারণা দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্যবাসীদের সভা, সমাবেশ, মিছিল, মানব বন্ধনের মতো শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচী গুলো সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ১৯৭২ সালে পার্বত্যবাসী তাদের ন্যায় সংগত দাবি সমূহ প্রথমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সরকারের মনোযোগ আর অবহেলার অভাবে পরবর্তীতে তা সশস্ত্র সংগ্রামে উপনীত হয়। তদ্রুপভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্যবাসী উপজাতিদের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর উপর যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। নয়তো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে যে আপাত শান্তিটুকু বিরাজ করছে তাও স্থবির হয়ে যেতে পারে। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের এরূপ উদাসীনতা ও অনাগ্রহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বাঙালি ও উপজাতীয়দের মনস্তাত্বিক বিরোধ। মুলত এই বিরোধের সূত্রপাত যখন আশির দশকে সরকারী পৃষ্ঠপোশকতায় সমতলবাসী বাঙালিদের

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে অনেক উপজাতি তাদের দীর্ঘদিন ভোগ দখলীয় জমি হারিয়ে তারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। একারণে প্রথম থেকেই পার্বত্য উপজাতিদের কাছে বাঙালি মানেই ভূমি দখলকারী উপদ্রপ। অপরদিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে সমতলবাসী বাঙালিরা স্থানান্তরিত হয়ে ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশগত বৈরি অবস্থার সম্মুখীন হয় ও পরবর্তীতে শান্তিবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর আক্রমন বাঙালিদের মাঝে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসবাস করতে হলে তাদের উপজাতিদের সাথে সংগ্রাম করেই বাঁচতে হবে। পরস্পরের প্রতি এই বৈপরীত্য মনোভাবই পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠতে দেয়নি। তাছাড়া চুক্তিটি সম্পাদনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের মনোভাব, দাবি-দাওয়ার প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় পাহাড়ের বাঙ্গালীরা চুক্তিটির বিরোধীতা করে চুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায়ই পাহাড়ীদের সমান হওয়ায় চুক্তিটি সম্পাদনকালে তাদের মতামত ও বক্তব্যকে সরকার ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে উপজাতিরা সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চাপ দিচ্ছে অপরদিকে পার্বত্যবাসী বাঙালিরা চুক্তি বাস্তবায়ন না করতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যকার ব্যাপক সংঘর্ষ উভয়ের মাঝে নিরাপত্তাহীনতার সংশয় সৃষ্টি করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়াটি কঠিন ও জটিল বাস্তবতার সম্মুখীন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের জনসংখ্যার অনুপাত বর্তমানে প্রায়ই পাহাড়ীদের সমান হওয়ায় স্বভাবতই জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে ভোট একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। রাজনৈতিক দল গুলো এই ভোটের রাজনীতির জন্য চুক্তি বাস্তবায়ন করে চুক্তি বিরোধীদের ভোট হারাতে চায় না। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালিরা এই চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী বাঙালিদের অভিবাসন রোধ করতে সরকারকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। তদুপরি স্থানীয় বাঙালি, উপজাতি ও সরকার এই ত্রি-পক্ষীয়ের উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের জন্য সমাধান খুঁজতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থায়ীত্ব করতে হলে নতুন করে আসা বাঙালিদের অভিবাসন রোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন জরুরী। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অভিবাসন রোধ করতে পারবে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী বাঙ্গালীদের অভিভাসন রোধ করা যাচ্ছে না। চুক্তির পরও পরোক্ষাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অভিবাসন অব্যাহত রয়েছে। যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এলাকা ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক এলাকা যেখানে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিক্য সেখান থেকে উপজাতিরা এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তি সম্পাদনের পরও ২০০৩ সালে মহালছড়িতে বাঙালি ও উপজাতিদের মাঝে যে দাঙ্গা হয়েছিল তা এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে। এভাবে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ অভিবাসন চলতেই থাকে তবে উপজাতিরা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু হবার আশংকায় পুনরায় সশস্ত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আর যা হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির বিপরীতে উপজাতিদের চূড়ান্ত অবস্থান। সুতরাং অবৈধভাবে বাঙালি অভিবাসন ঠেকাতে হলে আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যকর করতে হবে।

শুধুমাত্র চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও আগ্রহ। কর্তৃত্ববাদী ও সংখ্যালঘু দৃষ্টিকোন থেকে পার্বত্য সমস্যাকে সমাধানের চেষ্টা পরিহার করে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। খাগড়াছড়ির মহেশখালীতে ২০০৩ সালে পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গার ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ীরা সভা, মিছিল ও মানববন্ধনের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরে সকল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অথচ প্রায়শই চুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তি লংঘনের প্রতিবাদে পাহাড়ীদের সভা, সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদান, মানব বন্ধনের মতো শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচী গুলো সরকারের নিকট তাদের দাবি আদায়ে চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় উপজাতিরা দাবি আদায়ে সশস্ত্র আন্দোলনে ফিরে গেলে তা হবে শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত ব্যর্থতা। অতএব, সরকারের উচিত পাহাড়ীদের ন্যায় সংগত দাবি পূরণে তাদের রাজনৈতিক শান্তি পূর্ণ কর্মসূচীর প্রতি মনোযোগী হওয়া ও অতিসত্ত্বর দাবি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্থানীয় রাজনৈতিক দল গুলো এখনও দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িত। জনসংহতি সমিতি ও ইউ.পি.ডি.এফ এর মধ্যে প্রায় গুম, অপহরণ, হত্যার মতো সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। তাছাড়া পাশাপাশি জনসংহতি সমিতি প্রায়শই ইউ.পি.ডি.এফ এর সশস্ত্র হামলার পিছনে সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোশকতার যে অভিযোগ করছে তার নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়িত করা হলে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হতো। এক্ষেত্রে সরকারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় পর্যায়ের দলগত দ্বন্দ্ব সংঘাত, হত্যা, গুম, অপহরণের মতো নাগরিক নিরাপত্তার হুমকি এমন অপরাধ গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত হলে আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে উপজাতিদের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে পারতো। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পার্বত্য বাসীদের নিরাপত্তার অধিকারকে বাঁধাগ্রস্থ করছে।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। চুক্তি অনুযায়ী একটি পৃথক ভোটার তালিকা আজও প্রণীত না হওয়ায় পাহাড়ীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতিদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গুলোতে সরকার মনোনীত দলীয় লোক নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য জনসাধারণের নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকার তাদের মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা পরিষদ পরিচালিত করছে যা পাহাড়ীদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আর পাহাড়ীদের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত হলে পাহাড়ে পুনরায় অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত বলে বিবেচিত করা হয। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাই জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত কাঠামোর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর জরুরী। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক ভোটার তালিকা প্রণয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে পার্বত্যবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের ভোটের অধিকার স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে যা ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় পর্যায়ের জাতিগত সংঘর্ষ নিরসনে ভূমিকা রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যকার বিরোধের সূত্রপাত যখন আশির দশকে সরকারী পৃষ্ঠপোশকতায় সমতলবাসী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানারিত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যকার বিরোধ মিমাংসায় আঞ্চলিক পরিষদ উদ্যোগী হতে পারতো। আঞ্চলিক পরিষদের স্থানীয় কর্তৃত্ব পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রশামিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।

গবেষণা প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনায় ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ জাতিগত সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে কতগুলো অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তদ্রুপভাবে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হলে স্থানীয় উপজাতিদের মাঝে ভোট, নির্বাচন, অংশগ্রহণ, ভূমি ও সম্পদের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকারের মতো এই সকল অধিকার সমূহ নিশ্চিত করতে পারার উপর নির্ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়নের অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের এই অধিকারগুলো উপভোগের ও অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ শুধুমাত্র কাগজেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষমতায়নের অভাবে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর হয়নি। অর্থাৎ কাজীর গরু কিতাবে আছে, কিন্তু গোয়ালে নাই। আর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনে স্থানীয় উপজাতিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। স্থানীয় তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ উপজাতিরা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে কোন উপকারও পাচ্ছে না। অথচ আঞ্চলিক পরিষদ ক্ষমতায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে পারতো। অবৈধ ভূমি অধিগ্রহণ, জবর দখলের হাত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে স্থানীয় উপজাতিদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে পারতো। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হয়নি বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তিও প্রতিষ্ঠা পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৯ম অধ্যায়

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশর একটি জাতীয় সমস্যা। ভূ-অর্থনীতি, ভু-রাজনীতি সবদিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আর তাই এই অঞ্চলের স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কৃতিত্ব প্রকাশ করা সম্ভব। স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশেও তাদের প্রতি এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। অথচ তাদের দাবি গুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া হলে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রাম এড়ানো যেত। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল যে পাকিস্তান বৃহৎ শক্তি শাসকগোষ্ঠী হওয়ার সুবাধে যখন বাঙালিদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব না দেওয়ায় তা কিভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য কিভাবে তার জনগণকে আন্দোলিত করে তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দাবি গুলোর প্রতি স্বাধীনতাত্তোর সরকার গুলোর বিবেচনা ও মনোযোগ দেয়া হলে পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানো যেত। বরং পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটেলারদের স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে আরও মানবিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যকার অন্তদ্বন্দ্ব পরস্পরের প্রতি এমন বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয় যাতে করে পরস্পরের মধ্যে হত্যা, গুম, অপহরণের মত সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। সরকারের পৃষ্ঠপোশকতা ও সরকারী অনুদানের আশায় যে সকল বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয় তারাও ছিল হত দরিদ্র সহায় সম্বলহীন মানুষ। কিন্তু সরকারের প্রতিশ্রুত অনুদান সহযোগিতা তারা পায়নি। বরং ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির পার্থক্য তাদের জীবনকে অনিরাপদ করে তোলে। পরবর্তীতে বাঙালি এই সেটেলারদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তোলে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে সামরিক বিবেচনায় সমাধানের উদ্যোগ বিষয়টিকে আরও জটিল ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হলে চুক্তি সম্পাদনকে ঘিরে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। চুক্তি সম্পাদনের ফলে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামের সমাপ্তি হয়। চুক্তিটিকে ঘিরে এরূপ শান্তির প্রত্যাশা সবাইকে আকাংখিত করে। চুক্তি বাস্তবায়নের অভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি অন্তরায়। তথাপি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির যেটুকু আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে তার রাজনৈতিক মূল্য অনেক। চুক্তি সম্পাদনের ফলে প্রথম শান্তিবাহিনী সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদান করে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করে। তাছাড়া যে সকল উদ্বাস্তু পার্শ্ববর্তী দেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল সেই সকল শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার সার্থক হয়েছে। যদিও প্রতিশ্রুত অনুদান ও সাহায্য সহযোগিতা আজও পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি তথাপি শরণার্থী পুনর্বাসনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রায়ই পূরণ করা হয়েছে। পাহাড়ে

Dhaka University Institutional Repository

বসবাসকারী উপজাতিরা সশস্ত্র পথ ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারকে দাবি আদায়ে চাপ সৃষ্টি করছে। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সব সরকারের সময়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি সংকট হিসাবে এর জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি সম্পাদনের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল গুলোর মাঝে ঐক্যমতের অভাব ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিবিধ দুর্বলতার মধ্যে একটি হচ্ছে চুক্তিটি সম্পাদনকালে জাতীয় রাজনীতি বিভক্ত ছিল। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলো তীব্রভাবে শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যের সংঘাত এখন জাতীয় রাজনীতিকেও গ্রাস করছে। এরূপ একটি জাতীয় সমস্যার সংকট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক দল গুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রয়োজন ছিল সংলাপ, আলাপ, আলোচনার মাধ্যমে একটি সার্বজনীন চুক্তিতে উপনীত হওয়া। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার বৈঠকের আলোচনা সমূহ জনসম্মুখে প্রচার করা হয় নাই। এমনকি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে এই বিষয়ে জাতীয় সংসদে কোনরুপ আলোচনা হয়নি। ফলে চুক্তির পূর্বে চুক্তির ধারা, উপধারা গুলোর বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দল গুলোর মতামত দেওয়ার সুযোগ ছিল না। দেশের বুদ্ধিজীবী, গবেষক, লেখক, সংবাদ মাধ্যম কেউই চুক্তির পূর্বে তাদের মতামত দিয়ে চুক্তিটিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি এভাবে জাতীয় ঐক্যমত ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই প্রথম থেকেই সরকার পরিবর্তন হলে চুক্তিটি বাস্তাবয়নের স্থবিরতা দেখা যায়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, উপদল ও বিবিধ সংগঠন চুক্তিটির বিরোধীতা করলে সব দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আমাদের মাঝে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যৌক্তিকভাবেই বলা যায় জাতীয় ঐক্যমত ও রাজনৈতিক দল গুলোর মাঝে সংলাপ, আলোচনা ব্যতিরেকে চুক্তির যে কোন মডেলই গ্রহণ করা হোক না কেন তা চুক্তিতেই আবদ্ধ থাকবে। এমতাবস্থায় যদি সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল গুলোর ঐক্যমতের মধ্য দিয়ে চুক্তিটি সম্পাদিত হতো তবে সরকার পরিবর্তন হলেও চুক্তিটি বাস্তবায়নে স্থবিরতা দূর করা যেত। আর তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দেশের রাজনৈতিক দল গুলোর মাঝে সংলাপ, আলাপ, আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে চুক্তির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে একমত হওয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আপাত দৃষ্টিতে সশস্ত্র সংগ্রামের সমাপ্তি হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আংশিক বাস্তবায়ন পাহাড়ীদের তেমন সুবিধা এনে দিতে পারেনি। চুক্তির বাস্তবায়নের অভাব যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের অন্তরায় ঠিক তদ্রুপভাবে চুক্তির লংঘনও সমানভাবে পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। সরকার

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ব্যাতিরেকে ভূমি অধিগ্রহণ করছে। উপরোন্তু সরকার প্রভাবশালী আমলা, নেতা, এন,জি,ও যারা এ ভূমি দখলের সাথে জড়িত তাদেরও কঠোর হস্তে নিবৃত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থায়ী সেনাছাউনী দ্রুত প্রত্যাহার না হওয়া, স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে ব্যবহার না করা, শরণার্থীদের নিজ জমিতে পুনর্বাসিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, জেলা পরিষদ গুলোতে জনপ্রতিনিধির স্থলে সরকার মনোনীত নিয়োগ প্রভৃতি লংঘন সমূহ পার্বত্য উপজাতিদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি করছে। সরকার অনেক প্রতীক্ষায়, অনেক কষ্টে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে উপজাতিদের বিশ্বাস অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু চুক্তির ক্রমাগত লংঘনের ফলে পাহাড়ীদের বিশ্বাস নষ্ট হলে পুনরায় তাদের সাথে আর কোন সমঝোতা চুক্তিই সম্ভব নয়। অতএব, সরকারের উচিত চুক্তির লংঘন সমূহ পরিহার করে চুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী হওয়া।

সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও বাঙালিদের মাঝে জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। উপজাতি ও বাঙালি উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় নেতাদের মাঝে বৈঠক, সংলাপ ও আলোচনার আয়োজন করতে হবে। সরকার এখানে মধ্যস্থতাকারী সঞ্জালোকের ভূমিকায় বিবাদমান দুটি পক্ষকে পরস্পরের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা সমূহ সরকারের নিকট পেশ করতে পারেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে উভয়ের মাঝে জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পাহাড়ী ও বাঙালিদের জন্য বৈষম্যমূলক সুবিধা প্রদান। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের ভূমি ক্রয়ের মৌলিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটেলারদের ২০ বছর যাবৎ সরকারী রেশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই ধরণের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত গুলো উপজাতি ও বাঙ্গালী উভয়ের জন্যই বিভেদ ও বৈষম্যমূলক যা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের অন্তরায়। আর এক্ষেত্রে সরকারকে উভয় পক্ষের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিবিধ ধারা, উপধারা সমূহ কি সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে সেই সময়ের কোন নির্দিষ্টতার উল্লেখ নেই। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী সেনাছাউনী প্রত্যাহার, ভূমি সমস্যার সমাধান, শরণার্থী পুর্নবাসন প্রভৃতি চুক্তির ১৬ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থাৎ চুক্তিটিতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকায় সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপন করছে। তাছাড়া চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির মাঝে নিয়মিত বিরতিতে আলাপ আলোচনার সুযোগ না থাকায় চুক্তির বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সরকারকে নিয়মিত চাপ প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেক্ষেত্রে একটি

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক মনিটরিং সেল গঠন করে চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটিকে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলেও সরকার কি উপায়ে, কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের অধিকার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষার সংরক্ষণ করবে তার কোন পরিকল্পনা ও নির্দেশনা নেই। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে হলে বর্তমানে বসবাসরত বাঙালিদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কোন প্রক্রিয়ার কথাও উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায়, সরকারের উচিত কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে তার একটি সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা ও দিক-নির্দেশনা তৈরী করা। এক্ষেত্রে অপরাপর রাজনৈতিক দল, সুধী জনদের মতামত, সমালোচনা গ্রহণ করে বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট ও সমস্যা নিরসন করে শান্তিচুক্তি স্থায়ী শান্তির জন্য যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। বরং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরও বিবিধ ঘটনা সমুহের মূল্যায়ণ করলে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে সংঘর্ষ নিরসন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদকে প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতায়িত করতে হবে। আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা ন্যাস্ত হলে পার্বত্য উপজাতিরা তাদের নির্বাচন, অংশগ্রহণ, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার মত মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করতে পারবে। আঞ্চলিক পরিষদের স্থানীয় কর্তৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের জন সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এককথায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তই হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতায়ন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়িত করা জরুরী ও অত্যাবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি।

বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চার খন্ড (ক,খ,গ,ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন:

(ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্রই ইহার বিভিন্ন ধারায় নিবৃত ঐক্যমত ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানবলী , রীতি সমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইব বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহ্বায়ক।

(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য।

৪। এই চুক্তির উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুয়ায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পযর্ন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন:

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিনটি) আসন থাকিবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপধারা ১,২,৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার " এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্মোক্ত উপধারা সংযোজন করা হইবে "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"এর পরিবর্তে "হইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচিত বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বছর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বছর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্তি হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বছরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)-এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফের উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলার পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপসচিব সমতল একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে: "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উলেখ থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে: কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বছরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে: পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ- ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০,৫১,ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিয়তভাবে এইরুপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্মোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হইবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর থারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর থারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে:

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাবর্ত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাষা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে:

পরিষদে এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রনিত হওয়ার পর ও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিমোক্ত অংশটুকু সন্নিবেস করা হইবে : তবে শর্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে ।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন" এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে ।

৩১ । ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে ।

৩২ । ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুয়ায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে ।

৩৩ । (ক) প্রথম তফছিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে ।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সংযোজন করা হইবে : (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা ।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলির ৬ (খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে ।

৩৪ । পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত হইবে :

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

(খ) পুলিশ (স্থানীয়);

(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ;

(ঘ) যুব কল্যাণ ;

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ;

(চ) স্থানীয় পর্যটন ;

(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জনসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ;

(ট) মহাজনী কারবার;

(ঠ) জুম চাষ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক অরোপনীয় কর রেট, টোল এবং ফিসের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি ;

(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ;

(গ) ভুমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর ;

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর ;

(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস ;

(চ) সরকারি ও বেসরকারী শিশু প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর ;

(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়ালিটির অংশ বিষেশ;

(জ) সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পুরক কর;

(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কতৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পট্রাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালিটির অংশবিশেব ;

(ঞ) ব্যবসার উপর কর ;

(ট) লটারির উপর কর ;

(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর ;

গ) পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরুপ:

চেয়ারম্যান একজন,

সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন,

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন,

সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) ৬ জন,

সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ১ জন।

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মারমা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতির মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকুলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ন সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নিবাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন

।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এ পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিওদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তী কালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগনের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে :

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান ;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক অনুদান ;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা ;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য ও বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নবর্ণীত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন:

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯মার্চ' ৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ' ৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য অঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রযোজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুর্নবাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যে সব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করণের পূর্ণক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না। এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলে ভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে

(ক) অবসর প্রাপ্ত বিচারপ্রতি ;

(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি ;

(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার / অতিরিক্ত কমিশনার ;

(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট) ;

Dhaka University Institutional Repository

৬। ক) কমিশনের মেয়াত তিন বছর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ : যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে"।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া ও দেশি-বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান : চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পারিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নিদিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কেউ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রর্দশন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পারিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। (ক) সরকার ও জনসংগতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যান্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্রগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিবদীয় ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসিদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসিদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্র চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি

৮) সাংসদ, বান্দরবন

৯) চাকমা রাজা

১০) বোমাং রাজা

১১) মং রাজা

Dhaka University Institutional Repository

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী অধিবাসি তিনজন অ-উপজাতি সদস্য ।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ অগ্রহায়ন ১৮০৮ সাল মোতাবেক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)

আহ্বায়ক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি

বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)

সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সূত্র : The Chittagong Hill Tracts Accord of 1997. (n.d.). Retrieved December 29, 2014, from www.mochta.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

" সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নপত্র "

নাম ঃ

পেশা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

ঠিকানা ঃ

লিঙ্গ ঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

জাতিগত ঃ ☐ উপজাতি ☐ বাঙালি

উপজাতি পরিচিতি ঃ

১। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি করেছে। অনেকেই ছিলেন এর বিরোধী। এই বিরোধীতারে কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

২। পার্বত্য চট্রাগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকালে তদানীন্তন বিরোধীদল বিএনপি, জামায়াত এবং জাতীয় পার্টি এই চুক্তিটির বিরোধিতা করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমতের উপর পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত না হওয়াই চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম বাঁধা এমনটি মনে করেন কি?

৩। পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন? পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের ফলে আপনার কোন অধিকার নিশ্চিত হয়েছে কি?

৪। পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব, কার্যাবলি, ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বলে ধারণা করেন ?

৫। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন হওয়ায়, আঞ্চলিক পরিষদ থেকে আপনি কি ধরণের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছেন?

৬। পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় কি?

৭। পাবর্ত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক পরিবদের হাতে ক্ষমতার বন্টন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয়েছে বলে মনে করেন কি?

৮। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?

Dhaka University Institutional Repository

৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কতটুকু নিশ্চিত বলে মনে করেন?

১০। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও সেনানিবাস স্থাপনের ফলে স্থানীয় আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা পক্ষপাতমূলক কিনা?

১১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনীর সকল অস্থায়ী সেনা ছাউনী প্রত্যাহার করা হলে, স্থানীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বলে মনে করেন কি?

১২। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে "পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ" এ বাঙালি ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার আপনি কি যৌক্তিক মনে করেন?

১৩। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধান না হওয়ার মূল কারণ গুলো কি?

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানে আপনার পরামর্শসমূহ কি?

১৫। চুক্তি অনুযায়ী শরণার্থী পুনর্বাসনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ণ ও পরামর্শ কি?

১৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় উপজাতিদের দাবি আদায়ে তাদের মধ্যকার সংহতি ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে কি?

১৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু আঞ্চলিক দল (যেমন, ইউপিডিএফ; জেএসএস (বিক্ষুব্ধ)) চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বন্দ, সংঘাত শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিভাবে বাঁধাগ্রস্থ করছে?

১৮। আপনার মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাঁধা সমুহ কি কি?

১৯। আপনার মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম লংঘন সমূহ কি কি?

২০। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের উপর কতটুকু আস্থা রাখেন?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

সাক্ষাত প্রদানকারীদের নাম ঃ

১. প্রমোদ শেখর চাকমা	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
২. লিটন দেওয়ান - ১	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
৩. সুনীল কান্তি দে	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
৪. অরবিন্দু ত্রিপুরা	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
৫. লিটন দেওয়ান - ২	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
৬. শুভ জয় চাকমা	রাঙামাটি	১৪/০২/২০১২ ।
৭. অম্লান চাকমা,	রাঙামাটি	১৪/০৪/২০১২ ।
৮. ত্রিবিদ তংচৈঙ্গা	রাঙামাটি	১৮/০৬/২০১২ ।
৯. সুকেশয় চাকমা,	রাঙামাটি	২২/১২/২০১২ ।
১০. ললিত কুমার চাকমা	রাঙামাটি	২২/১২/২০১২ ।
১১. জহুরুল হক	রাঙামাটি	২২/১২/২০১২ ।
১২. টুকু তালুকদার	রাঙামাটি	২২/১২/২০১২ ।
১৩. শুভ চাকমা	রাঙামাটি	২২/১২/২০১২ ।
১৪. প্রসেনজিত চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
১৫. চিকন ধন তনচৈঙ্গা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
১৬. সুনীল চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
১৭. ভগদত্ত চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
১৮. রাজ বিহারী চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
১৯. অনুকূল চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২০. রাজেশ চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২১. লিটন চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২২. তাপসী দেওয়ান	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২৩. শর্মি দেওয়ান	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২৪. মিলি চাকমা	রাঙামাটি	২৩/১২/২০১২ ।
২৫. জীবন চাকমা	রাঙামাটি	০৭/০৪/২০১৩ ।
২৬. ত্রিদিব রায়	রাঙামাটি	১৩/০৪/২০১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. রতনা দীপ মারমা	বান্দরবন	১৫/০২/২০১২।
২৮. মৃন্ময় মারমা	বান্দরবন	১৫/০২/২০১২।
২৯. কিয়ামন মারমা	বান্দরবন	১৫/০২/২০১২।
৩০. অনুত্তর মারমা	বান্দরবন	১৫/০২/২০১২।
৩১. বিশাখা মারমা	বান্দরবন	১৫/০২/২০১২।
৩২. রুমেল দেওয়ান	বান্দরবন	১৬/০২/২০১২।
৩৩. মং মারমা	বান্দরবন	১৬/০২/২০১৩।
৩৪. মং সায়েং মারমা	বান্দরবন	১৬/০২/২০১২।
৩৫. বিজয় খিয়াং	বান্দরবন	১৬/০২/২০১২।
৩৬. সৌরভ বড়ুয়া	বান্দরবন	১৬/০২/২০১২।
৩৭. উছারি মং মারমা	বান্দরবন	১৬/০২/২০১২।
৩৮. কোচিনু মারমা	বান্দরবন	০৬/০৮/২০১২।
৩৯. বিজয় তংচৈঙ্গা	বান্দরবন	০৭/০১/২০১৩।
৪০. রাহুল দেওয়ান	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪১. মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪২. সিলভিয়া খিসা	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪৩. মনোজ রয়	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪৪. সুগত তালুকদার	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪৫. মেঘা ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪৬. উত্তম কুমার বড়ুয়া	খাগড়াছড়ি	০৯/০২/২০১৩।
৪৭. গৌতম ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	১৩/০২/২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
341.52
TAP

469998

Acc: 469998